শুদ্ধিপত্র।

পাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত ভ্রমগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন। সামান্য ছাপার ভুলগুলির প্রতি লক্ষ্য করা হইল না।

	অশুদ্ধ।		শুদ্ধ।
১ পৃষ্ঠা ৫ম ছত্রে—	যত	স্থানে	মত।
৭৬ পৃষ্ঠা ২য় ছত্র—	মহাচ্ছন্দে	„	মহাছন্দে।
৮৮ পৃষ্ঠা শেষ ছত্র—	একার	„	এ কার।
১৪৮ পৃষ্ঠা ২০ ছত্র—	বল্লীলতাচ্ছিন্ন	„	বল্লীলতাচ্ছন্ন।
২১০ পৃষ্ঠা ৪র্থ ছত্র—	হেতু	„	সেতু।
২৪৪ পৃষ্ঠা, ১৫ ছত্র—	হইতে নীলাভায়	„	নীলাভা হইতে নীলাভায়।
২৫৭ পৃষ্ঠা ১১শ ছত্র—	শুইয়া যে বড় ভয় পাইয়াছি	„	শুইয়া আছি—কিন্তু বাহির হইয়া যে বড় ভয় পাইয়াছি।
২৫৮ পৃষ্ঠা ১৬ ছত্র—	যেমন	„	যখন।
ঐ ১৮ ছত্র—	কল্পনাকে	„	কল্পনা যে।

নিবেদন।

পরলোকগত সতীশচন্দ্র রায়ের কবিতা ও গদ্য রচনাগুলি তাঁহার বন্ধুগণের আগ্রহে ও যত্নে প্রকাশিত হইল। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি কবিতা ও গদ্য প্রবন্ধ বঙ্গদর্শন প্রভৃতি মাসিক পত্রে বাহির হইয়াছিল। অন্যগুলি তাঁহার খাতা হইতে বাছিয়া লওয়া হইয়াছে।

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ইতিপূর্ব্বেই এই কবিটিকে বঙ্গীয় পাঠকবর্গের নিকট পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। কবিবরের গদ্যগ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডে "বন্ধুস্মৃতি" শীর্ষক বিভাগে সতীশচন্দ্রের স্মৃতি লিখিত হইয়াছে।

যাঁহারা ইঁহাকে ভাল করিয়া জানিতেন, তাঁহাদের সকলেরি আশা আছে যে বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার এই রচনাগুলি তাহাদের সকল অসম্পূর্ণতা সত্বেও বিশেষ সমাদর লাভ করিতে পারিবে। এখন পাঠকবর্গ তাঁহাদের এই আশা পূর্ণ করিয়া গ্রন্থখানিকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইলে পরম আনন্দের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই।

১২৮৮ সালের মাঘে সতীশচন্দ্র বরিশাল জিলার অন্তর্গত উজিরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতামহ স্বর্গীয় তিলকচন্দ্র রায় বরিশালে বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন জমিদার ছিলেন। জমিদারীর ভগ্নদশায় সতীশ সেই পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখকষ্টের মধ্যে মানুষ হন।

বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে ইনি বরাবর অধ্যয়ন করিয়া

সেখান হইতে এফ্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অধ্যয়নার্থে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। বি, এ পরীক্ষার জন্য যখন প্রস্তুত হইতেছেন তখন কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে ইঁহার পরিচয় ঘটে এবং কিয়ৎকালের মধ্যেই তিনি ভবিষ্যৎ সাংসারিক উন্নতির আশা জলাঞ্জলি দিয়া বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে জীবন উৎসর্গ করেন।

কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে তাঁহার অল্প বয়সের বহু রচনা ছিল, কিন্তু সেগুলির কোনটাই তেমন আকার প্রাপ্ত হইয়া উঠে নাই। কলিকাতায় থাকিতে এবং বোলপুরে আসিবার পর হইতে তিনি যে সকল রচনা লিখিয়াছিলেন, তাহারাই এ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।

তাঁহার কয়েকদিনের মাত্র একটি ডায়ারী পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহারি মধ্যে তাঁহার নিজের জীবনখানি এবং অন্তরের প্রতিকৃতিটি বড় স্বচ্ছ এবং সুন্দরভাবে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। 'ডায়ারী'র মধ্যে ব্যক্তিগত কথা থাকিলেও তাহা সেই কারণে যথাযথ ভাবে এই গ্রন্থে প্রকাশ করা হইল।

পশ্চিমে একবার ভ্রমণ করিতে গিয়া সতীশচন্দ্র বসন্তরোগে আক্রান্ত হন এবং ১৩১০ সালের মাঘীপূর্ণিমার দিনে ২২ বৎসর বয়সে বোলপুরে প্রাণত্যাগ করেন।

তাঁহার জীবনচরিতের মোটামুটি ঘটনাগুলি এই। কিন্তু যে অমরতার জীবন তিনি যাপন করিয়াছিলেন তাহার ঘটনা এত সংক্ষেপে সারিয়া দিবার মত নহে। তাহার পরিচয় এই গ্রন্থের মধ্যে ছড়াইয়া আছে। আমাদের বিশ্বাস সুধী পাঠক তাহা আপনিই পড়িয়া লইতে পারিবেন।

সতীশচন্দ্রের রচনাবলী

(সতীশচন্দ্র রায়)

মূল্য ১।০ পাঁচসিকা মাত্র

প্রকাশক

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী

শান্তিনিকেতন

বোলপুর।

আদিব্রাহ্মসমাজ প্রেস্

৫৫, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত

১৩১৯

সতীশচন্দ্রের রচনাবলী

কবিতা।

আজি।

আজি পূর্ণ হত যদি আজিকার মাঝে!
তপনখচিত এই নভ-চন্দ্রাতপ
সুগভীর নীল ছটা মাথায় বিরাজে,
বান্ধব বিটপী যত পল্লব-সৌষ্ঠব
বিকাশে কবির মত সুন্দর প্রচুর,—
সহকারে বাড়ে ফল নিটোল কঠিন
সরস কৈশোরসম! তপ্ত সুমধুর
সোমরসসম আলো! জরালসহীন
সারাদিন চ'লে যায়—ক্ষণে কর্ম্মপর,
ক্ষণে নেত্রবারি মোছা, ব্যথিত অন্তর,—
কভু তীব্র রৌদ্রালোকে বঙ্কিময় পথে
চলে যাওয়া কতদূর বাধাহীন পদে,
কভু স্থির ব'সে থাকা ক্ষান্ত দিয়া কাজে!
আজি পূর্ণ হয়ে যাক্ আজিকার মাঝে!

—*—

রৌদ্রমুগ্ধ কবির চিঠি।

একজন যুবা কবি বসন্ত প্রত্যূষে,
কলিকাতা নগরীর দ্বিতল মন্দিরে,—
নূতন রৌদ্রের রাশি, নীল নীলাকাশ
সমস্ত সম্মুখে করি'—সুন্দর বাতাস
কপালে কপোলে কর্ণে চক্ষুতে লভিয়া
কল্পনা-প্রদীপ্ত ভালে লিখিছেন লিখা—
—বঙ্গ-সমুদ্রের দ্বীপে,—সেই যে সন্দীপ—
তাঁর এক মন-গড়া সুহৃদের কাছে।
—কবিদের খেলা!—যাক্, লিখিছেন যথা-

বন্ধুবর; শীত গেছে, বাতাস তরল!
সুগভীর নীলাকাশ সুস্থ, সুবিমল,
ধ্যানসম নির্ব্বিকার। বৃহৎ গগনে
রৌদ্র উঠিয়াছে জাগি আনন্দিত মনে।
বহু কথা মনে পড়ে—গ্রামের প্রান্তরে
দুটি বড় বড় পক্ষী হরষঅন্তরে
উড়িয়া, বঙ্কিম পথে আসিছে নামিয়া,—
রৌদ্রভার বুকে ঠেলি', পৃষ্ঠে অনুমিয়া,
শুভ্র পাখে আঘাতিয়া, পদে আচড়িয়া—
আমার চিত্তও যেন উঠিয়া পড়িয়া

রৌদ্র-সমুদ্রের মাঝে সাঁতারি গভীর
ক্রীড়া আজি করিতেছে। ওই নগরীর
লোকজন—স্কন্ধে রাখি' সারঙ্গ পুরাণ,
ভিখারী আসিয়া গায় ব্রজগোষ্ঠ গান,
সহসা অনেকগুলি শিশুর নয়ন
চাহি' থাকে তার দিকে। করি' গুঞ্জরন
সারঙ্গ ব্যথিছে বাল-বালিকার প্রাণ।
ভিখারী সে—জানাইত কি তার সন্ধান—
তবু তার মুখ যেন একটু সুন্দর,
হেতু—ওই সারঙ্গের গুঞ্জরিত স্বর
আর এই রৌদ্ররাশি—সঙ্গতির গুণে
কুৎসিতেও ফুটে রূপ।—যাক্ তাহা শুনে
তোমার কি ফল? সেই—কি লিখিতেছিনু?
হাঁ সেই যে রৌদ্ররাশি হর্ষে সন্তরিনু!
তারপর কি করিনু?—উড়িয়া উড়িয়া
উর্দ্ধমুখে, চক্রে চক্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া
আবার নামিয়া এনু।—প্রাণ যেন ভরা।
আজি যেন সুখে দুঃখে পরিপূর্ণ ধরা।
অভাব কোথাও নাই—প্রাণের গহ্বর
আজি যেন রশ্মিজালে পূরা ভরভর।
তাই যবে স্বাস্থ্যহর্ষে বাড়াইনু হাত—
"বাহুডোর পূর্ণ কর হে মধু প্রভাত"

—এইরূপ আক্যাক্তিয়া (জানত, মানব
মানবেই চায়, কিছু নহে অভিনব)—
"বাঞ্ছডোর পূর্ণ কর হে রৌদ্র-সাগর"—
অমনি তোমায় যেন পেনু, বন্ধুবর !
কোথা তুমি ? কোথা ? মোর দৃষ্টিতে ত নাই ?
—পরাণ কিছুতে আজ হারিবে না ভাই !
বলে প্রাণ—"চক্ষে নাই ? তা'তে কিরে ? সেই
সমুদ্রের দ্বীপে আছে স্মরণে কি নেই ?
—সেই যে চারিদিকেই উথলে সাগর
পাতালের বাসুকীর গরজে পাগর—
সেই যায় তীরমুখী ঊর্ম্মির উপর
বেত্রতরী তুলি দিয়া জেলের কোঙর,
হুস্ করি' নেমে পড়ে বারিরাজ্যমাঝে,
জল উঠি' উচ্ছ্বসিয়া চারিধারে নাচে,
ডুবায় উপুড় করি', কাৎ করি তরী
—শিশুদের কোলাকুলি !—জেলে উঠি' পড়ি'
হাসিয়া ভাসিয়া উঠে—তরণী সরল
সমুদ্রের বুকে ভাসি' চলে কলকল।
স্থূল কেশরাশিসম গোছান' সে জাল
ছত্রাকারে মেলি' পড়ে, খুঁজিয়া পাতাল
ডুবি' যায়—কালো কালো ডম্বুরের মত
সারে সারে চারিধারে ভাসে শত শত—

নীল জল, নীলাকাশ, ম্রাণ রৌদ্রভায়,
গম্ভীর জেলের ছেলে, মৎস্যের শীকায়!
সেই যে নূতন দ্বীপ! জীর্ণ পুরাতন
হর্ম্ম্য কিম্বা মসজেদ, মন্ত্রভবন,
মিনার কি অট্টালিকা কিছু যেথা নাই—
যেথায় অল্পই আছে মানুষের ছাই।—
বালুকার ভূমি শুধু, দীর্ঘ তৃণদল,
স্থানে স্থানে নীলপুঞ্জ নবীন জঙ্গল।
ভূবিৎ,তাদের সেই জীবজীর্ণ শিলা
যেথায় খুঁজিতে গেলে পাবে শুধু ঢিলা
সমুদ্রের বালুকার, শুক্তিশেষ, শ্বেলা
আর নানা প্রকারের মৎস্যহাড় মেলা।
সেই যে পক্ষীর দল, উড়ি ঝাঁকে ঝাঁকে
মাঝে মাঝে ঋতুচারে যেথা এসে থাকে,
ভূনিক্ষিপ্ত থালাসম সারি লুটাইয়া
সুদীর্ঘ সৈকতভূমে, ত্বরায় বসিয়া
কত কলরব করে। সেই যে সে দ্বীপে—
মনে নাই?—এক যে নিরালা অন্তরীপে
একটি ভবন আছে? সেথায় খেলায়
একটি বালক উঠি' সকাল বেলায়,
গো মহিষ অজ মেষ পশ্বাদির সনে—
মা তাহার, কোন দিন সারিয়া রন্ধনে,

ক্ষণেক বিশ্রাম তরে, গুয়াবনচ্ছায়
কটিতে রাখিয়া হাত কখনো দাঁড়ায়
সহসা দর্শন করি' চক্রবালাবধি—
বালুচর রৌদ্রোজ্জ্বল, ঊর্ম্মি নিরবধি,
পাখীদের অত্যুদার স্বচ্ছন্দ প্রচার,
নীলাকাশ আর সেই নীল জলভার।
মনে পড়ে সে বালকে? বৃহৎ সে প্রাণ
ধরণীর ঔদার্য্যের যেন এক দান—
বিপুল বটের মত—সেই যে বাড়িছে?
চৌদিকে প্রকৃতি তার হাস্য প্রসারিছে
আনন্দ ভ্রূকুটিমুক্ত, উদার, নবীন।
মহিষ লয়ে সে মাঠে ধায় প্রতিদিন—
গরু রাখি' তরুছায়ে, তরুমূলে শুয়ে,—
সমুদ্রে নয়ন, মাথা হস্ত পরে থুয়ে,
রৌদ্র করে অনুভব, সিন্ধু অনুভব,
সুখস্পৃষ্ট প্রাণে প্রতি বিন্দু অনুভব—
মনে নাই?—হাঁ হাঁ মনে পড়েছে পড়েছে।
সেই যে মহান বন্ধু—তার সঙ্গে দেখা
যখন যৌবনকূলে ফিরেছিনু একা
মহত্ত্বের সৌন্দর্য্যের গভীর বিরাম
অন্বেষিয়া ব্যগ্রপ্রাণে। কত ফিরিলাম,—

কোথা লোক? প্রাণ যার মুক্ত? পৃথিবীর
সর্ব্ব ছাপ পড়ে যেথা? লঘু কি গভীর—
প্রতিকণ জড় জীবে রন্ধ্র এক করি'
উপনীত হয় গিয়া অসীম উপরি?
দৃঢ়বাহু—ওই জেলে ছেলের মতন
জীবন-সমুদ্র মাঝে করিয়া ক্ষেপণ
নিজেরে সহসা, বহু দুলিয়া ডুবিয়া
আবার আনন্দে উঠে হাসিয়া ভাসিয়া—
হাস্যমুখে ফলা বস্তু ফেলে কর্ম্মজাল—
"নিশ্চয় উঠিবে মৎস্য"—ধৈর্য্যদৃঢ় ভাল।
সে লোক নিশ্চয় অতি ঘোর ভালবাসে
—তা' ন'লে কি জলে পড়ি ওইরূপ হাসে?
—জীবন, জীবন ভাই। আনন্দ জীবন—
এই খুঁজি' মনে মনে করিতে ভ্রমণ;
তব সঙ্গে দেখা বন্ধু বহু বহু বার।
তবু কোন দিন তব গৃহ খুঁজিবার
আবশ্যক পড়ে নাই। আজি এ কিরণে,
নভোভার বহি' বুকে আনন্দিত মনে,
সত্যই যখন মোর পত্র লিখিবার
আবশ্যক হ'য়ে গেল অতি অনিবার—
জানিলাম তব নাম—প্রাণ দিল কহি'।
পোষ্টাফিস্ বাক্স হ'তে এই পত্র বহি

পিয়ন নিবে না কভু। আমার লিখন—
আমি এক রাজহংস করেছি পালন—
(নলদময়ন্তীদুত তার বংশধর)
সে এখনি পাখা মেলি' এই রৌদ্রপর—
লয়ে যাবে তব পাশে। পত্রখানি পড়ি,
রেখো, বন্ধু, মোর তরে আয়োজন করি—
বসিব সমুদ্রকূলে—গুয়াবনচ্ছায়—
ধর, কোন স্তম্ভীভূত উচ্চ মৃত্তিকায়।
দুদণ্ড আলাপ হবে মাতাপুত্র সনে—
(যে মাতা সমুদ্র দেখে সারিয়া রন্ধনে)
ততক্ষণ পাখীগুলি উড়িবে আকাশে।
কচ্ছপ আসিবে চলি' সিকতার পাশে।
বহুদূর বালুচর—হস্ আসে ঢেউ,
হস্ কলকল্ পুনঃ চলি' যায়, কেউ
কোন দিকে নাহি আর—রৌদ্র জলজল।
বিদায় সুহৃদ তবে। আলো বক্ষ চাপে
ওরি মাঝে যেন তব হৃদিস্পন্দ কাঁপে।
যাই তবে, দেখা হবে যাই ; বন্ধুবর,
সমুদ্রে কেমন এবে জলে দ্বিপ্রহর!

এ এক আশ্চর্য্য চিঠি ! কোন্ পোষ্টাফিসে
ছাড়িব বুঝে না পাই। কই, দশদিশে
রাজহংস বলেও ত কিছু না নেহারি !
কবিদের কাণ্ড সব ! যাক্ দিনু ছাড়ি—
এ পত্র সমুদ্র মাঝে। এ কলিকাতায়
দাঁড়াইয়া পরাণের সমুদ্রবেলায়
দিনু ছুঁড়ি পত্রখানি। ওগো কবিগণ,
তোমরা বুঝিয়া লও কি এ জলপন।

—•—

প্রাতঃপ্রবুদ্ধা ।

সখি, মোরে তোর স্বপনের কথা বল ।
এ প্রভাতে তোর মুখখানি নিরমল !
কুন্তলে তোর বিকল কুসুম
পাখা মেলি যেন নয়নের ঘুম
উড়ে গেছে কোন্ অজানা গগনতল ?
বল্ সখি, তোর স্বপনের কথা বল্ ।

কখন্ তোমার হৃদয়ে তুলিলে বাস
অরুণ অধরে হাসিয়া মধুর হাস !
স্খলিত আঁচল তুলি দিলে রাখি'
উরঃ কলি পরে, সযতনে ঢাকি
বিগত নিশার কি গোপন অভিলাষ ?
—আপনার রসে হাসিয়া মধুর হাস ?

ফুলসম তোর কপোল ফুটেছে দুটি—
নয়নভৃঙ্গ তদুপর পড়ে লুটি !
আভাময় অতি ললাট-কিশোর
সারা মুখখানি আলো করি তোর
ঈষৎ হাসির কিরণ পড়েছে টুটি !
ফুলসম দুটি কপোল উঠেছে ফুটি !

বল্ সখি তোর স্বপনের কথা বল—
দেখেছিস্ তুই নিশার গভীর তল ?
রতনআলয়ে ত্রিদশ কিশোর—
হাত ধরাধরি চলেছে কি তোর ?
চুমি নেছে হরি বয়ষের আঁখিজল ?
বল্ বল্ তোর স্বপনের কথা বল

—•—

ভগ্ন বাড়ির দেবতা।

চুপ্ চুপ্ চুপ্, নীরবে নীরবে—
আয় তোরা সবে, যা তোরা সবে—
সোণার ফড়িং সোণামক্ষিকা।
উতর দখিন পূবের দালান
এখনও ঘুমে অন্ধ নয়ান
শুধু পশ্চিমে ধব্‌ধবে জ্যোতি
পট তুলি' দিয়া জাগে সম্প্রতি।
ফুল ফোটো ফোটো, নীরবে নীরবে—
আয় তোরা সবে, যা তোরা সবে—
সোণার ফড়িং সোণামক্ষিকা।

ঘুরিয়া থামিয়া কিরণের মাঝে
সোণার ফড়িং নাচি নাচি বাচে।
প্রজাপতি তার পাখার ব্যজন
মৃদু মেলি'—যেন হানিয়া কিরণ
মৃদু মৃদু ঘাতে—আপনার কায়
সঞ্চারি' তারে, লইবারে চায়।
ঊর্ণনাভ সে দুয়ারে দুয়ারে
নিজ রাজপথে নামি' বারে বারে
পথ রচনের করে সন্ধান
করিত যেমন পুরাণো রোমান।

চুপ্ চুপ্ চুপ্ নাহি গোলমাল
বড় সুখে আছি, এ দীর্ঘকাল।
হাতী ধপ্‌ধপি, ঘোড়া খট্‌মটি'—
দরোয়ান যত বকি' কট্‌মটি'—
সারসের দল করি' কোলাহল,—
বালকগুলি সে ঘোর চঞ্চল,—
গৃহিণীরা যত সুখে ও সরমে,—
দাসদাসী যত গৃহের করমে,—
আর উঠে নাক সকাল বেলায়
আছি সুখে আমি আপন খেলায়।

সোণা মক্ষিকা, সোণা মক্ষিকা
ওই দেখ ফুটে কাঞ্চন শিখা
করবীর ফুল চারুপাতা ভারে
যাও লুঠি পড় ওই রসধারে!
ধীরে ধীরে ক্রমে শুকালে শিশির
রবিদেব হ'লে শিরোপরে থির
ভাঙ্গা দ্বারগুলি পরখ করিয়া
—যাহে তারা কভু উঠিবে নড়িয়া—
বাতাস গোপন দূতের মত
চলিবে হর্ম্ম্যে ইতস্ততঃ।

এই কত তরু, হর্ম্ম্য এ চারি—
সংসার হ'তে রাখি' অপবারি'
রাজ্য আমার পেতেছি হেথায়
মানুষ বাসের পরিহাসেছায়।
নরের শূন্য হাসি উপহাসি'
ফুটে হাহাশ্বেত ধুস্তুর রাশি।
শুষ্ক মাথার কঠোরতা দেখে,
ভাঙা কুঠরিটি দিছি ওই রেখে,—
ইষ্টক যত কুঞ্চিত কালো
কোথাও কঠিন তীক্ষ্ণ ছুঁচালো—
শুধুই নীরস নীরস ঘাস,
এর পরে জনমিছে বারোমাস,
শুষ্ক মুখের দাড়ির মতন।
হেথা দেখ এই কণ্টকবন—
হিংসুকজন-মনের কাহিনী
প্রকাশ করিয়া দেখাবেন ইনি।
ওই করবীরা গর্ব্বিনীদের—
হাসে গোলত্ব, বরণ দেহের।
কুন্দলতায়, ছোট লাল ফুল,—
অবলা মানের জেনো সমতুল!
ছোট অঙ্গটি দেখ লাগে লাল,
সন্ধ্যা না হ'তে কালিম কপাল

গ্রীবা লুটিয়া ভাঙিয়া পড়িবে,
আপন ক্ষীণতা স্মরিয়া ঝরিবে।
ওই দেখ মোর ফড়িং বেবাক্
হাসি' মুহুমুহু মানুষী পোষাক,
চক্র ধরিয়া কিরণে ঘুরিছে।
ওই শুন ঘায়-শবদ ফুরিছে
অতি কর্কশ আদেশের মত।
মাকর্ষা বুনে জাল অবিরত
দেখায়ে বিজ্ঞ-বুদ্ধির পাক।
আরো কত ছবি আছে লাখেলাখ।

আঙিনায় আমি পা দুটি মেলিয়া
যত চুল পিঠে খুলিয়া ফেলিয়া
রাণী সম রহি সমস্ত দিন।
ঝড়কালে রহি কক্ষেতে লীন—
মাতে বায়ুদল, মেঘ ছাড়ে জল,
দুয়ারে দুয়ার, পড়য়ে আছাড়,
খসে চূণকাম, ভেঙ্গে পড়ে থাম,—
হয়ে যায় শেষে সব কিছু থির
আমি বাহিরাই হাস্যে অধীর—
ভগনাবশেষে ভ্রমি ফিরি সুখে
একা রাণী আমি রাজ্যের বুকে।

আজ দেখ কিবা রোদ পড়িয়াছে—
কাঁচি হলুদের রঙ ধরিয়াছে—
পা মেলিয়া সুখে আঙিনায় বসি'
দেখি পাতা ধীরে পড়িতেছে খসি',—
ঘাসে ঘাসে বায়ু ফেলিয়া চরণ
চলেছে কোথায় চোরের মতন।
কাঁপি ওঠে রোদ—ডুব দি বাতাসে
বায়ু সম যাই মিশিয়া আকাশে।

—•—

মধ্যাহ্নে।

কিরণ নীরব নীলাম্বর সুগভীর!
স্তম্ভিত আলোকে দৃষ্টি ক্লান্ত ফিরে আসে।
আজি স্তব্ধ চারিদিক এ বনরাজির!
একি এ রভস রাগ! কাননের পাশে
কারা যায় ধীরে ধীরে? ধীরে কয়ে ভাষা,—
লঘুতর পদক্ষেপে ভ্রমিতেছে আজি।
প্রাণ মোর! কেন, তুই—কি তোর নিরাশা—
পারিস না বাজাইতে তোর তন্ত্রীরাজি
এই সুরে এ রভস সাথ? তবু হিয়া
তার ক্ষুদ্র অতুষ্টির উত্তেজন চাকি
সহজে স্তম্ভিত মৌন মূক হ'য়ে গিয়া
হেরিতেছে চারিধার—অনিমেষ আঁখি!
একি এ ভুবনময় মহিমা রবির
কিরণ নীরব একি গগন গভীর!

—•—

আজি আমি পৃথিবীর স্তব্ধ রঙ্গালয়ে
একা ব'সে, দেখিতেছি মূক ছায়ানাট।
পাদপপ্রাসাদ হ'তে অবতীর্ণ হ'য়ে
ছায়া ব'সে আছে মৌন, সরসীর ঘাট।
বিহঙ্গক মুহুঃ উড়ে শীস্ থামাইয়া।
পত্রজাল ধীরে ধীরে ওষ্ঠ নামাইয়া
চুম্বনে গোপন করে প্রস্ফুট কুসুম।
স্তব্ধ জলে মৌন উর্ম্মি, স্তব্ধ বনভূম।

—•—

অপরাহ্নে।

অপরাহ্নে দীর্ঘতর শ্রান্ত ছায়া আঁকা
ধরণী বিমৌন পড়ি, আলোক সুন্দর
আকাশ ভরিয়া ফেলে' বৃক্ষরাজি পর
সুধারস দেয় ঢালি'—মেলি' চিত্র পাখা
নানা পক্ষী উড়ি উড়ি পড়িছে প্রান্তরে—
এ নীরব রূপ হ'তে লভিছি অন্তরে
দুঃসহ মৌনের ভার—সমীরের সনে
মনে হয় বিজড়িত অস্ফুট বচনে
সুগন্ধ পরশ কার—মোরে অন্ধ সম
করিতেছে আলিঙ্গন—পরাণের ব্যথা
নাহি ঘুচে। কোথা কোথা সেই অনুপম
মধুরিমাপরিপূর সান্ত্বনার কথা—
তিল রোধে যে কথাটি বহি' অনুচ্চার
দুঃসহ করিছে এই মৌন রূপ ভার!

—•—

স্বপ্ন—সম্মুখের।

এ স্বপন সারাদিন ধ'রে!
সোনার আলোকময় ঘরে
যে পতঙ্গ উড়ে উড়ে আসে,—
যে পবন, বন হ'তে সৌরভ বিলাসে
জড়ায় এ ললাট আমার—
যত হাসি, সুখ সবাকার—
নব জীবনের যেই আনন্দের ধার
—শতস্রোতা সুখগঙ্গাধারা—
ভাঙ্গে মোর আপনার কারা—
সকলে তাহারা আনে একটি স্বপন
কি রজনী কিবা দিন নাহি নিরূপণ!

বসন্ত-আভাস লয়ে প্রাণে
যে সমীর আসি' বক্ষ হানে
তা' সম ব্যাকুল মোর প্রাণের পিয়াস
ধায় চারি পাশ
স্বপনে পাগল হ'য়ে সঙ্গোপন মাধুরী খুঁজিয়া
কস্তুরী মৃগের মত মদগন্ধে আত্ম হারাইয়া
আপন নাভির
স্বপ্নভ্রমে অধীর অস্থির!

হের এই নিকুঞ্জ মাঝার—
(ফুলরেণু উড়ে চারিধার
ফুটে ফুল, চুমে অপ্সরার !)
পল্লব কিরীট মাথে তার !
ফুলের তারকা মাঝে মাঝে
কণ্ঠে তার দোলাদোল ফুলমালা সাজে !
এ কি নীলাম্বর পরিধান !
কোন্ বন-দেবতার দান !
সমুদ্রতলের আলো অন্ধকার মিশা
গভীর নয়নযুগ হেরে কোন্ দিশা !
পীন বক্ষে যেন দুই কপোত ঘুমায়
শরীরে লুকায়ে গ্রীবা,—কত স্নেহে তায়,
কি করুণা, কি উত্তাপ, মধুর যতন,—
রেখেছে কি অনুরাগে করি' সম্বরণ !
তাহার পরাণ ?
সে যে মোর এ বিচিত্র শত শত
স্বপ্নে নিরমাণ !

সারা দিন এ মোর স্বপন !
গান গেয়ে উঠি ক্ষণে ক্ষণ !
স্বপন ? স্বপন কি গো ? কিছু নহে আর ?
তবু মোর এ যৌবন, সর্ব্বস্ব আমার

সেথা ছুটে, সেথা লুটে
শত বার সেথা পড়ে
লভিছে মরণ !
সারাদিন এ আমার সোণার স্বপন !

—•—

স্বপ্ন—পশ্চাতের।

ও—রাতি গভীর গভীর
অন্ধকার এ মোর কুটীর!
সারারাতি ঝরে জল, ভেসে যায় গৃহতল
ভাঙ্গা ঘরে একা ব'সে জাগ্রতে স্বপন!
—সারা দিবসের পরে এসেছে এখন!
সুন্দর করুণ মুখ, ভয়ে দুরু-দুরু বুক
আলু থালু কেশপাশ, কভু হাহা নিশ্বাস,
মোর কোলে মাথা রাখি, দুহাতে বয়ান ঢাকি
আকুল ক্রন্দন—
ভাঙ্গা ঘরে একা ব'সে
জাগ্রতে স্বপন!

ভাঙ্গাচুরা জগতের মাঝে দ্বীপ একখানি
সেথা সন্ধ্যাঅন্ধকার, তরু করে কাণাকাণি!
সেথায় প্রভাত নাই, আলো নাহি পায় ঠাঁই
শুধু কভু মেঘচ্ছেদে স্ফুট চন্দ্রকর—
মাঝে মাঝে দীপ্ দীপ্ জোনাকিপ্রকর
অশ্রুর প্রদীপ সম অন্ধকার মাঝে!
সেথা সেই ভাঙা ঘরে ভূমে নামি' বসিয়াছে
কে গো অয়ি আকুল কুন্তলা?
অয়ি কে গো কাতরা দুর্বলা!

ছেঁড়া ধূলা ফুলদল, তোমার চরণতল
পড়িয়া যে ওই রহিয়াছে—
হোথায় নিরখি' দেখ, একখানি পরাণের
যত কিছু ইতিহাস—আছে।
দেখ দেখ প্রাণ তোর আপনার ভস্মরাশি
কর নিরীখন—
দলে নাই চরণে সে, ওই আঁখিনীরে ভেসে
ঝরাদল, মঞ্জরী সযতনে তুলি
হৃদয় মরমস্থান খুলি'
সেথা ধীরে করিছে গোপন!

ও—রাত্তি গভীর গভীর!
অন্ধকার এ মোর কুটীর!
সারারাত্তি ঝরে জল, ভেসে যায় গৃহতল
ভাঙ্গা ঘরে একা ব'সে
জাগ্রতে স্বপন!

—•—

পরীর জন্মকথা।

দুপরের বেলা গালে হাত দিয়ে
জননী একাকী ভাবিছে বসিয়ে!
ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ
কি রঙের স্রোত
ঝরিয়া ঝরিয়া ধুয়ে চারিদিক্
বহিছে, জননী ব'সে অনিমিখ্

দেখিছে গাছের বিমোহন রূপ
গোহালে গোরুরা ক'রে আছে চুপ,
বাছুরের চোখ
সহেনা আলোক—
মুদে মুদে আসে, রসনা মেলিয়া
গাভী লেহে তারে ; সে মাথা হেলিয়া

চুপ ক'রে থাকে,—মুখ সুকোমল
চক্ চকে—সেথা ফেণা জলজল!
ছাগশিশু ওই
ছায়ামাঝে রই
আয়েস করিয়া চিবাইছে ঘাস।
খাঁচাটির মাঝে তুলি আঁটি শাঁস

পাতারাঙা শুক খুঁটি খুঁটি করে,
ঘাড় বেঁকে কভু ঠোঁটে তুলি ধরে—
রাঙা রাঙা ঠোঁট!
উলোট পালোট
ডাঁটার মতন জিভ দেখা যায়!
টিক্‌টিকি হেথা হোথায় লাফায়;—

'ঠিক্‌ঠিক্' বলি ওঠে বা কখন্
মৃদু মৃদু কাঁপে গলাটি তখন!
স্বরা এক কাক
ছাড়ি দিল ডাক
নারিকেল শাখা হ'তে 'কা—আ—কা'
(আহা, রব খানি কি সুধাই মাখা!)—

অমনি মায়ের প্রাণ আসি উঠে
চোখ ভরি' জল কোথা হ'তে ছুটে!
কি হয়েছে হায়!
বাছারা কোথায়!
উঠি চলে ত্বরা জননী অধীর
হেনকালে এল নধর শরীর

ভাই বোন দুটি আঙিনার মাঝ—
দুজনার চোখে একইতরো ভাঁজ,

ভুজনারি চুল
লুটে ছল ছল
কপালের পর, কপোলের পর—
আলো ফুটে যেন তাহার ভিতর !

বাগান হইতে আনিয়াছে তারা—
চম্পা—তাদেরি বরণের পারা—
অপরাজিতার
আনিয়াছে ভার ;
এনেছে করবী আরো কত ফুল !
সহসা মায়ের পরাণ আকুল—

চোখে জল ছুটে, হাসিটিও ফুটে,
দোঁহা পানে ধায়, অঞ্চল লুটে,
ভরি লয়ে বুক
চুম্বে চিবুক
দাঁড়াইয়ে থাকে হইয়ে বিভল,
বার বার কেন চোখে আসে জল !

এ ভরা দুপর—এই খর রোদ !
কোথা গেছিলরে দুইটি অবোধ
কোন্ বন পাশ ?
সেথায় গোসাপ

খর জিভ্ লুহি' লুহি' ধীরে চলে
সেথায় শুক্‌নো পাতাগুলি জলে

কত গিরগিটি বাহিরিয়া আসে,
মাথার জটায় করাত প্রকাশে,
চুপ্ করি বসে
রাঙা হয় রসে
শুষিয়া রুধির বালবালিকার—
কিযে কুদৃষ্টি গিরগিটিটার !

কিন্তু শঙ্কা কিছু নাই নাই—
দেখ কত ফুল ছুটি বোন ভাই
আনিয়াছে তুলে !—
সে বনের কূলে
নিচয় পরীরা এসেছে খেলাতে
ফুল তুলে দেছে এ দোঁহার হাতে !

এই দেখ চাঁপা এই যে করবী
অপরাজিতা এ, হেথায় সুরভি
ভুঁই চাঁপা ফুল—
ছোট পরীকুল—
এই সব নিয়েইত খেলা করে !
নিচয় জানিয়ো এই ফুলথরে

পরীদের রঙ পরীদের পাখা
পরীদের আঁখি নীল আছে আঁকা!
সত্যই জানি
পরীদের রাণী
অপরাজিতায় বেগুনিয়া রঙে
চালায়েছে তুলি ;—ঝুমুকার সনে

নাচিতে নাচিতে ঝুমুকার পরে,
পীত পদরেণু প'ড়ে গেছে ক'রে—
ঝুমুকা মরমে
প্রণয়ে সরমে
তাড়াতাড়ি চুমি, পালায়েছে কোনো
পরী—সেথা মধুমদিরা এখনো!
তারা যেই বনে গিয়েছে লুকায়ে
ফিরেছে বাছারা খেলাটি চুকায়ে।
কেউ গেছে চলি'
জল পড়ে গলি'
শেহালার মাঝে,—ঝিনুকেতে কেহ
ঠাণ্ডা আলয়ে ঢেকে দেছে দেহ—

কেহ গেছে ঢুকি শামুকা ভিতর
সেই যে কতই চিত্রিত ঘর!

আর কতগুলি
ফুলে ফুলে ফুলে
রেণু, মধু, আর রঙ হয়ে গেছে—
খেলা শেষ ক'রে বিদায় নিয়েছে !

রোজ রোজ বনে বাছারা যে যায়
এদেরি সঙ্গে বুঝি বা খেলায় !
আবার আবার
চোখ ভরি মার
জল ওঠে ভেসে, হাসি ফোটে মুখে ।
দাঁড়ায়ে বিভল দুলায় সে বুকে

শিশু দোঁহাকারে ! বিজন দুপর—
ছায়া পড়ে মার কপাল উপর,
স্বপনের আভা আঁখি পত্রে লাগে
মনে, বনে বনে পরীদল জাগে !

—•—

চাঁদ।

ওকি শঙ্খ সুধাভরা আকাশ-সাগরে
ভাসিয়া উঠেছে মেঘ-ফেন-মালা-মাঝে
মন্দ্ররাব প্রচারিয়া গম্ভীর অম্বরে
অনন্ত নীলিমা ভরি, শ্রবণে না বাজে
ধ্বনি যার ? অথবা ললাটপট কি ও,
বিভাবরীসুন্দরীর মোহসুধা-মাখা
নিদ্রারস-পরিপূর ? বুঝি স্বরগীয়
অপ্সরার হৃদয়মাধুরী ওই আঁকা
চলিয়াছে আঁধারের মাঝ দিয়া ভাসি'
প্রথম বেদনামোহে, আজ—যবে হায় !
মরতবাসীর কার প্রেম অভিলাষি'
সুরসভা হ'তে ঝরি পড়িল ধরায়
অভিশাপে,—নীলাম্বর সাগরের পায়
সঙ্গীতে রুধিয়া দিল স্বরগের দ্বার !

—•—

আরো মনোহর তুই, চন্দ্রমা উজলা !
ধরার অঞ্চলঢাকা অভিসারদীপ,
রজনীর কুঞ্জবনে রস-বিহ্বলা
যখন মিলনে যায়, কুরুবকনীপ

হেলায় ছড়ায়ে পথে ! ইন্দ্রজালে তোর
শত যতনের কাজ শ্লথ করে ছাড়ি'
আধেক ধরণী উঠে হইয়া বিভোর—
মেদুরমন্দির-প্রাণে !—খেয়া দিয়া পাড়ি
সংসারের তট হ'তে স্বপনের তটে
পঁহুছি জাগিয়া উঠে—জলকুলুস্বর
জাগি উঠে, জাগে স্বপ্ন মেঘমালাপটে
পরাণ হইয়া উঠে আপনি বিধুর !
রবি আনে জাগরণ প্রদীপ্ত প্রখর
তুমি আন স্বপ্নলোকে বিধুর জাগর ।

—•—

দিবাভাগে চাঁদ।

(শুক্লনবমী)

ডুবিয়া আছে তরী—
কিরণময় সুনীল নভ-সাগরমাঝে পড়ি—
ডুবিয়া আছে তরী!
বাহিরি' গেছে সকল লোক অযুত লাখ কাজে
ছায়ায় রোদে অলসলীলা শূন্য বনমাঝে!
মাঠের শেষে আকাশ ছাপি' রৌদ্র বেয়ে পড়ে,
দীপ্ত ধরা চাহিয়া আছে অনন্ত অম্বরে—
শুক্ল পাখা নবম ঘাতে চন্দ্রতরীখানি
কত না দূর, সাগরে পালে নিজেরে টানি আনি
সহসা আলো ঝঞ্ঝাবাতে মাঝগগনে পড়ি,
ভাঙিয়া হাল ছিঁড়িয়া পাল বিপথে গিয়া সরি,
ডুবিয়া গেছে তরী!

উঠিবে জাগি তরী—
লক্ষ দীপ জাগিবে যবে আলোকশিখা ধরি—
উঠিবে জাগি তরী!
ইন্দ্রজালে গগনভালে আঁধার আসি' যবে
জমিবে রসে, ধরার আঁখি বন্ধ হয়ে রবে!
তখন তারে স্বপন দিতে জ্যোছনাধারা ঢালি
মলিন ছায়া জাগাতে বনে মন্দ প্রভা জ্বালি'

চলিয়া যেতে প্রান্ত হ'তে প্রান্তে নববলে,
পরায়ে দিতে পারিজাতেরি মালিকা নদীগলে ;
ঘটাতে শত মিলনলীলা ধরার উপবনে
আকুল ধ্বনি জাগাতে বীণে বিরহী বাতায়নে—
নবমী চাঁদ পরীর মত শরীর শোভা ধরি,
টানিয়া হাল, জুড়িয়া পাল, উঠিবে নড়ি চড়ি,
উঠিবে জাগি তরী !

—•—

নিশীথিনী ।

সোনার সন্ধ্যার পরে এল রাত্রি, বিকাশিল তারা
দিগন্ত মিলায় বনে নভস্তল চন্দ্রকলাহারা ।
কালো অন্ধকার যেন কালো এক ভ্রমর বিপুল
আবরিয়া বসিয়াছে ধরণীর মধুময় ফুল !
সেই আলো-প্রস্ফুটিত লক্ষদল কুসুম সুন্দর
তারি পরে বিস্তারিয়া কালো ডানা গভীর অন্তর
বিদারি, অতল মধু বিহ্বলিয়া করিতেছে পান
ধরণী-গগনে লাগে মধুরসজোয়ারের টান !
রস-ভরা বহে বায়ু বনস্পতি শাখায় সঞ্চরি—
রসাবেশে বনস্পতি আপনারে রেখেছে আবরি ।
প্রান্তরের ক্ষুদ্রতম তৃণমুখে লেগেছে শিশির
অতল নিদ্রার রসে ডুবে গেছে জীব ধরণীর !
সত্য কোথা নাহি জানি, নাহি জানি সত্য কারে কই
মনে হয় এ আঁধার একেবারে নহে রস বই !

—০—

দুয়ো-রাণী।

ঘুঁটে কুড়াইয়া, পথে ঝাড়ু দিয়া,
সারাদিন ধরি' ব্যথাভরা-হিয়া,
বারবার আঁখি মুছিয়া মুছিয়া,—

দুয়োরাণী আসি' সাঁঝের বেলায়
বসেছে বাগানে তরুর তলায়—
জীর্ণকুটীর কাছে দেখা যায়!

ওই-ই তার ঘর—হোথা নিতি রাতে
ঘুম যায় দুয়ো তৃণশয্যাতে,—
ঘুঁটে কুড়াইতে জাগে রোজ প্রাতে।

আজি সায়াহ্নে একটি তারকা
নভোজানালার খুলিয়া ঝরকা
উঁকি দিল যবে—(বুঝি বা শঙ্কা

সাধ হল তারে সাঁঝ এল কি না)—
তখন একেলা দুয়ো বিমলিনা
তরুর তলায় হইলা আসীনা।

চুপে চুপে, মনে নিলা মৃদুনাম
একটি ফুলের, করিলা প্রণাম
দীপশিখা-আঁকা দূর দেবধাম—

শঙ্খঘণ্টা বাজিছে যেথায়—
নটীগণে মিলি' নাচিছে যেথায়—
সখীগণে ল'য়ে রাজিছে যেথায়

ঠাকুরদুয়ারে সুখী সুয়োরাণী
পরিয়া তাহার চেলবাসখানি।—
দাঁড়ায়েছে রাজা জুড়ি' দুই পাণি

করি' পরিধান কৌষেয়বাস—
ললাটে তাহার চন্দনাভাস।
উঠিছে সুরভি-ধূম্রের রাশ

চারিদিক্ ঘিরি',—প্রদীপার্চ্চনা
হেরিতেছে পুরবাসী সবজনা।
এদিকে বাগানে, আঁধার-মগনা

জোনাকী-মালিকা লতিকার পাশে
একাকিনী দুয়ো চুপ্ বসি' আছে—
কোমল আঁধার সকল আকাশে।

কি ভাবিছে দুয়ো?—ভাবিয়া না পায়-
ব্যথিত পরাণ তার কি যে চায়?—
স্বপনের মত মনোমাঝে তার

সকল অতীত জীবন তাহার!
এই মনে পড়ে এক বালিকার
মূঢ় খেলাধূলা,—হাসিরাশি, আর

দুখরাশি যত,—এই মনে পড়ে
ব্রতমঙ্গল কোন্ সে বছরে।
দূর্ব্বা ও ফুল রাখি' থরে থরে

কত দেবতার পূজা-আরাধনা—
হায় কত মূঢ় মনের কামনা!
—পতিবর মাগা, পুত্র-যাচনা!

"হায় না বুঝিয়া কত-কি যে বলি
বালিকা-বয়সে!—ছলনা কেবলি!
—সেই সব দিন কোথা গেছে চলি'!

* * * * *

"অবশেষে এল বিবাহের রাতি।
—এরি মাঝে মোর কত খেলাসাথী
পতিবতী হ'য়ে, সুখ-ঘর পাতি'

"বসেছিল,—তারা জানাত আমায়
আঁখি নীচু করি' চোখের আভায়—
—পতিবতী নারী কত সুখ পায়!—

"সুখ? হায় সুখ!—সুখ-ই বটে! সুখ!
খালি করি' ফেলি' বাপমার বুক,—
ভাইভগিনীর বিসরিয়া মুখ,

"পিছু ফেলি আসি খেলার কানন,
একখানি কোন অচেনা আনন
বুকে ভরি' ল'য়ে ভাবা অনুখন—

"সুখ বটে তাই?—সুখই বটে হায়!
ঐ ত, রমণী ঐ ত রে চায়!—
—যাহা আছে তার তাহা ফেলে যায়!

"—তার তরে শুধু ব্যাপিয়া হৃদয়
সুগভীর ম্লান ছায়া লেগে রয়—
যাহা নাই তারি অভিমুখে বয়

"নদীর মতন বনছায়া দিয়া
আপনার মাঝে আপনি কাঁদিয়া!
নিজে সে কি যায়? হায় মূঢ় হিয়া!

"বিধাতাই তারে গড়েছে এমন—
কালে কালে তার নূতন বেদন
জাগায় পরাণে নূতন চেতন,

"নূতন কল্পিয়া করয়ে অধীর।
—স্থির নাহি রয় সুখ ধরণীর—
যাতনা কেবল অবলা নারীর!

"মনে পড়ে সেই নূতন বেদন—
মনে পড়ে সেই নূতন চেতন—
মনে পড়ে রাজরথের কেতন

"বেলাশেষকালে দেখা দিল দূরে—
তত্থন আমি হর্ম্ম্যের চূড়ে
সখীগণে ল'য়ে, নূপুর-কেয়ূরে

"মালাকুণ্ডল চেলবাসে সাজি'
বসেছিনু—হায়! স্বপন সে আজি!
দেখিতেছিলাম রাঙা মেঘরাজি

"আমারি মতন হয়ে ও লাজে
কারে অপেক্ষি' চুপ্ করে' আছে—
কত বরণের ঢেউ তার মাঝে

"উঠিছে পড়িছে, আমারি হিয়ায়
ভাবগুলি যথা আসে আর যায়।
সহসা অমনি কাঁপাইয়া কায়

"বাজিয়া উঠিল মধুর বাজনা—
রাজ-আগমের আগে ঝঞ্ঝনা—
কে ও রথ'পরে ?......বিধি বঞ্চনা

"কহিলা আমায় !—স্মরিয়া কি ফল ?
ওরে নারি, তোর নয়নের জল
যেথা হ'তে আসে—সে নদী অতল !

*   *   *   *   *

"শুধু যদি সুখ দুখ হ'য়ে যেত—
নারী যদি শুধু এই দুখ পেত,—
তবে ভাল, সেই এক গান গেত

"জীবন ভরিয়া,—অমার মতন
রহিত সুচির আঁধারে মগন।
কিন্তু আবার একি এ লিখন

"হায়, হতবিধি, কেন নব চাঁদ
আন্দোলি' তার হৃদয় অগাধ,
নব নব দিয়ে বিতরে প্রসাদ—

"বাড়ায় দ্বিগুণ বেদনায় ব্যথা ?
অজানা নূতন আবেগ, মমতা
কেন গো মোয়ায় তা'র হৃদিলতা ?

"রাজগৃহসুখ, স্বামি-প্রসঙ্গ
হয়েছে, আমার হয়েছে ভঙ্গ।
অথবা রাণীর সোণার অঙ্গ—

"কে চায়, বিধাতা!—নাহি চাই চাই—
প্রিয় প্রেমসুখ—যা গিয়াছে তাই—
তার লাগি' মোর কোন খেদ নাই!

"উদ্দেশে নমি' প্রাণেশের পায়
বলেছি—'হে নাথ দিলাম তোমায়
'যাহা দিয়েছিলে হেলায় খেলায়—

"সকল আদর, সুখচুম্বন,
'কতই সোহাগ, প্রেমালিঙ্গন—
'সকলেরি মাঝে যে প্রেমরতন

" 'দিয়েছ, তা' পায়ে নিবেদিনু, বসি'
'স্মৃতিঘরে, প্রেম-চন্দনে রসি'!
'যে ক'টি অশ্রু পড়িতেছে খসি'

" 'তাও মুছিলাম—তুমি সুখে রহ—
'নব সুখ আনি' কোলে তুলি' লহ।
'পালিব আজ্ঞা—যাহা তুমি কহ,

"'খুঁটে কুড়াইয়া কাটাব জীবন'—
—জান বিধি, আমি হেন নিবেদন
করিয়াছি কি না !—তবে, এ, এখন—

"এখনো আবার কেন এ বেদনা ?
কেন জননীর এ নব চেতনা ?
কেন নিশিদিন রয়েছি বিমনা—

"কারে পাব যেন বুক ভরি' মোর—
কারে পাব যেন ভরি' এই ক্রোড় !—
এ কণ্ঠে যেন কার বাহুডোর

"কোমল-পরশে ফুটাইবে ফুল !
কেন নিশিদিন চিত্ত আকুল
ব্যথায় লালসে—এ কেমন ভুল !

"যাদের লাগিয়া এই দীন দশা—
তাদেরি লাগিয়া কেনরে বিবশা !
তাদেরি লাগিয়া—আঁখির বরষা !

"হায় !......না না, মোর বাছাধনগুলি—
তেমনি কি ? হায়, চোখে দিয়া ঠুলি,
রেখেছিল মোরে ! আঁধারে 'আগুলি'

"রেখেছিল তারা ত্রিভুবন মোর!
হায় গো সতীন, মোর ধন-চোর,
কি করেছি আমি কি করেছি তোর!

"বাছারা আমার—সত্য কি তাই?
কেমনে জানিব? কিছু দেখি নাই!
না না, আমি মনে অনুভবে পাই

"সুন্দর তারা—রাজার কুমার!
কিংশুক-ঠোঁটে হাসি সুধাধার!
জ্যোতিমাখা দেহ—বরণ চাঁপার!

"গভীর আঁধার ওগো উপবন,
জোনাকী নিতারে জ্বালি' বনে-বন,
কি দেখিছ তুমি? আঁধার-গগন,

"তারা-মেয়েগুলি ছাদে দিয়া সারি
বসেছে যে—ওরা কাহার ঝিয়ারী,—
কোন্ রূপকথা বড় মনোহারী

"শুনিতেছে ওরা?—তোমাদেরি কাছে
হে বন গগন, চলি' কি গিয়াছে
বাছারা আমার অপরূপ সাজে

"খেলা খেলিবারে ? তাহারা কেমন ?
আমি ত দেখিনি !"—মুদিয়া নয়ন,
ভাবি' ভাবি' হেন হয়ো নিমগন।

নিমগন হয়ো সুখময় নিদে
তরুরি তলায়, কঠিন ভূমিতে—
স্তব্ধ আঁধার বসি' চারিভিতে !

হায় হয়োরাণি, একি হ'ল তোর ?
কি নবীন মোহে হইলি বিভোর
না জেনে না শুনে ? একি মোহঘোর !

মোহে ঘুমাইয়া প'ল হুয়োরাণী।
ছুটি' পড়ে তারা, রাগে রেখা টানি'—
মুছি' ফেলে রেখা ঘরা কার পাণি !

কত তারা ম'ল—রেখা নাই কোনো—
আঁধার আকাশ !—ওকি ?—ওই শোনো
দ্বিতীয় প্রহর বাজিছে !—এখনো

ঘুমাইছে হয়ো ?—রজনী গভীর !
এই সে প্রহর কুহকী রাতির
যবে নামে আসি' তীরে ধরণীর

যত দেবদূত যত পরীদল—
ফুলমাঝে তুলে গড়াইয়া ফল ;—
দিবসের কাজে শিথিল বিকল

ফুল-লতা-তরু-প্রাণের মাঝার
বরষিয়া যায় স্নেহসুধাধার ;
মধুর স্বপন নিয়ে আসে আর

ক্লান্ত পুরুষ নারীর লাগিয়া ।
তাই সবে ওঠে সকালে জাগিয়া
নূতন উষার বরণে রাঙিয়া !

দেখে দুয়ো দেখে হয়রস্বপন !
দেখে দুয়ো দেখে মধুর স্বপন :—
জাগ-জাগ যেন রাজ-উপবন

ভোর গোধূলীতে—'মা-মা'—এ ডাক
কোথা হ'তে আসে ? অকিছে কি কাক ?
অই ! 'মা—!' দুয়ো শুনিছে অবাক !

তাড়াতাড়ি ছুটে পুকুরের তীর
এল দুয়ো—তার চোখে বহে নীর !
অই ! 'মা—মা—' চাপা-কান্নাটীর

আড়াল হইতে ডাকিছে মধুর !
'মা-মা—' উঠিছে সাতখানি সুর !
পারুল একটি দাঁড়ায়ে অদূর—

সেথায় হ'তেও 'মা—' কে ডাকিছে ?
দুয়ো চারিদিকে চমকি চাহিছে—
চাহিছে—সঘনে হৃদয় কাঁপিছে !

একি অদ্ভুত ! একি এ আবার !
বুক হ'তে তার ছুটি ক্ষীরধার
পড়িছে চম্পাকুঞ্জমাঝার,

কেন বা ছুটিছে পারুলের পানে ?
—এবার পড়িল দুয়োর নয়ানে—
বাছাগুলি তার আছে কোন্‌খানে !

কিবা সুন্দর বালকবালিকা !
কোনো দেবতার যেন ছবিলিখা !
পারুলচম্পাফুলেরি কলিকা !

দাঁড়াইছে দুয়ো থামি' স্নেহভরে
বিমূঢ়সমান—চরণ না সরে !
সাত চাঁপা আর পারুল অধরে

বর্ষিছে ক্ষীর।—ক্রমে মুখ'পরে
দুয়োর, ঊষার নবারুণ করে,
হাসি খেলে যায়! ক্রমে পাখিস্বরে

জাগে চারিধার—চলে লোকজন—
প্রভাত! প্রভাত!—চমকি তখন...
—হায় দুয়ো হায়, ভেঙেছে স্বপন!

কোথায়? কোথায়?—গভীর তিমির!
দ্বিগুণ আঁধার!—বুকে বয়ে ক্ষীর,
দুচোখে দুয়োর বাহি' পড়ে নীর!

কোথায়? কোথায়?—কেবল জোনাকী
বুজিতেছে আর মেলিতেছে আঁখি—
নিজমনে বন খেলিছে একাকী!

আকাশের' পরে দীপ্ দীপ্ করি'
তারা-বালিকারা খেলে লুকোচুরি—
গভীর আঁধার আকাশ আবরি!

কোথায়? কোথায়?—হায় দুয়োরাণী!
ধৈরজ ধর সান্ত্বনা মানি'।
কালি প্রভাতের কিরণ-মেলানি

বন বন ভরি' ফুটাইবে ফুল !—
তোমারো এ নব স্নেহের মুকুল
বিকসিবে। নাহি, নাহি তাহে ভুল !

এ গভীর ব্যথা, আশা অস্ফুট
দীরি' বাহিরিবে পরিয়া মুকুট,
নবীন কুমার সুবর্ণকূট !

রাণীদলমাঝে হ'য়ে গরবিণী
শুনলো চম্পা-পারুল-জননী,—
উজলিবে তব বাহারা ধরণী।

—●—

ছায়ায়াগর্ভসম্ভূতং।

রাত্রিকালে বহিয়া গেল বায়ু—
থামিয়া গেল পাতার ঝর্‌ঝর!
কে যেন প্রেত নামিয়া এসে পুনঃ
চলিয়া ফিরি গেল আপন ঘর!

চন্দ্র হ'তে ধীর কিরণ-ধারা
বিদারি' মেঘ পুষ্ট আর ম্লান
চক্ষে আসি' ধূমের মত ছুঁ'ল।
সহসা ধীরে ঠেলিয়া মাথা "জান"

কে যেন কহে "জানরে আমি কে?
"অথবা আর কি কাজ জানাজানি?"
ধরিতে মোরে, অথচ ধীরে ধীরে
তুলিয়া নিল, পৃষ্ঠতলে পাণি।

সুদূর গেনু বায়ুর মাঝে দিয়া
লাগিল দেহে ঠাণ্ডা খরতর,
নিদ্রা তবু নয়ন পরে চলি'
ভুলায়ে মোরে রাখিল। অতঃপর—

দেখিনু যেন অন্ধকার মাঝে
উচ্চ অতি মিনার এক জাগে—
সেথায় আমি দাঁড়ানু সাবধানে,
কেহই নাহি পশ্চাতে কি আগে!

ছাড়িয়া গৃহ, নূতন বাহিরিয়া
বালক যদি নদীর পথে যায়,
রাত্রে যদি নিদ্রা বিষমাঝে
জাগিয়া তার চতুর্দ্দিকে চায়,—

—ঊর্দ্ধ আর নিম্ন জুড়ি একি !
নভের তারা নদীর জলকোলে
দীর্ঘ হ'য়ে কাঁপয়ে শতবার
ঢেউয়ের সনে থরথরিয়া দোলে !—

পুরাণো সেই ধরণী গেছে দূর
অন্ধকারে বৃক্ষরেখা নাহি',
চারিটি ধারে তারার দিকে তারা
আঁধার পানে আঁধার আছে চাহি !

নূতন যদি বালক হেন জাগে
তাহার মত লাগিত বুঝি মোর !—
কিন্তু সবই স্তব্ধভরে ছিল
নয়ন ভরি' আমার ঘুমঘোর !

ঊর্দ্ধে, সেই মিনার পরে থাকি'
সভয়ে চাহি' দেখিনু চারিধার—
এ যেন মহা হতাশ্বাস সম
বিপুলকায়া আঁধার-বারিধার !

তাহারি মাঝে তুলিয়া মহারব
ছুটিয়া চলে জাহাজ একখানি—
ত্রিতল পোত, চলিছে মহাবেগে—
কোথায় ছুটে—কেমনে, বল, জানি ?

হয়তো কোন ঘূর্ণীজলপাকে
(লক্ষ যোজন ব্যাপিয়া যার ব্যাস)
পড়েছে পোত, চলেছে ছুটি' জোরে
বৃত্তপথে কেবলি বারোমাস।

উচ্চতলে নিম্নতলে লোক
মধ্যতলে চলিছে কত লোক !
কোথাও ছুটে হাসির ফোয়া আর
কোথাও বহে অশ্রুধারে শোক।

কোথাও ওই চিত্রকক্ষ মাঝে
নানান্ রঙে প্রদীপরাজী জ্বালি'
বসিয়া গেছে আমিরি দরবার
রজ গড়ায় সেথায় কায়া ঢালি' !

কোথাও কভু, খড়্গ ধরি' করে
ধাইছে কেহ, পালায় ভীরুপাল
কোথাও কেহ রজ্জু-ফাঁসি গলে
ঝুলিয়া শুধু রয়েছে চিরকাল !

সুদূর কোণে পড়েনি কোন আলো—
শবের পরে বসিয়া এক নারী—
—রুক্ষকেশী, ছিন্নচীরা ভীমা—
চিবায় নব, পুরাণো হাড় ছাড়ি!

কোথাও—যেথা অন্ধকার-ক্রোড়ে
খানিক শুধু পড়েছে দীপ-আলো,
সকলি যেন দেখায় কিছু কিছু,
অথচ যেন দেখায় নাহি ভাল—

—কোথাও হেন, একেক জন লোক
বয়ন কাছে মুকুর পরসারি',
সসম্ভ্রম ভক্তিভরে চাহি'
আপন দাড়ি দেখিছে নাড়ি' চাড়ি'!

কোথাও কেহ পালক স্ফীত বহি'
সমুন্নত শিরস্ত্রাণ পরে—
এধার হ'তে ওধার চলি' যায়
পদাঘাত-প্রবণ দম্ভভরে!

কতই রঙে কতই সাজে সাজি'
চলিতে আছে লক্ষ লোক মেলা!
কেহই যেন কিছুই জানে নাহি
কি কাজ কার!—সকলি যেন খেলা!

আরেক ছবি দেখি চমৎকার !
আসিয়া পড়ে সবার মাঝে মাঝে
আঁকিবাঁকিয়া পার্শ্ব কাটি' কোথা'
চরণ ফেলি' একান্ত কার কাছে
একটি ছায়া দৈত্যসম দেহ—
চিরটিকাল ছুটিয়া চলিয়াছে !

কিন্তু হায় কেহই নাহি দেখে—
কখনো হায় ! তাহার উরুতলে
হারায়ে যায় একেক জনা লোক
কে খোঁজে তায় ? মানুষ যায় চ'লে !

ঊর্দ্ধছাদে একটি দল লোক
শৈত্য আর অন্ধকার সহি'
দাঁড়ায়ে আছে—কি যেন তারা চায়—
দাঁড়ায়ে আছে আপন-ভার বহি'—

তাহারা শুধু দুষ্ট ছায়াটিরে
ধরিতে চায় খানিক দৃঢ়করে—
দুষ্টছায়া অঙ্গ আঁকি' বাঁকি'
চলিয়া যায় আপন পথে স'রে !

চতুর্দ্দিকে অন্ধকার মাঝে
তাহারা তবু তীক্ষ্ণ চোখে চায়—

ছায়ারে চোখে রাখিতে চাহে স্থির
যদিও যাক্ আঁধার-কিনারায় !

দুষ্টছায়া তবুও কভু আসি'
পিছন হ'তে লয় কাহারে ঢাকি'
লুপ্ত ক'রে ডুবায়ে ফেলে কোথা !—
নিমেষ মাঝে—না উল্টাতে আঁখি !

এমন করি' জাহাজ ঘুরি' মরে
দেখিনু আমি মিনারে দাঁড়াইয়া
হঠাৎ উঠে হাজার শত লোক
জাহাজ মাঝে হস্তে তালি দিয়া !

—সহসা গেল মিনার আর পোত
আবার আসে স্বপ্ন-আঁধিয়ার !
পক্কবান্ প্রৌঢ় মোরে ল'য়ে
রাখিল কোথা সাতসাগর পার !

* * * *

গভীর আমি স্বপ্ন দেখি' সদা
ঘুমায়ে যেন পড়িছি রাতিদিন !
আঁধার আসে আকাশ হতে নেমে
আঁধারে জ্বলে তারা পরিক্ষীণ !

বিশ্ব যেন হর্ম্ম্য সম এক
বিশাল যেন একটি পুরী মত,
দাঁড়ায়ে আছে সমুদ্রেরি তীর
উর্ম্মি আসি ঘট্টে শত শত।

সকলি যেন অন্ধকারে ঢাকা
মধ্যে যেন তারার আলো কাঁপে
নিদ্রাভরি' বিভাবরীই যেন
লক্ষ লক্ষ যুগান্তর যাপে!

—•—

দুঃখ-দেবতার মূর্ত্তি।

পশ্চিম দিগন্তে যেথা গভীর সিঁদুর
যেন কোন উপন্যাস-রাজার মহাল-মালা
ভাঙ্গিয়া পড়েছে চুর চুর—
যেথা ওই ঊর্দ্ধ ভাগে সন্ধ্যার কালিমা লাগে
মসীর প্রাকার যেথা বনান্ত সুদূর—
যেথা জানি তরঙ্গিণী পড়িয়া বনের ছায়ে
লোটায়ে কাঁদিছে রুদ্ধস্বর—
সেখানে বসিয়া আছে,
কণ্ঠে শ্লথ গ্রীবা পরে
স্থির রাখি' মাথা খানি তার—
বেশবাস অযত্ন শিথিল
ঢালা বাহু স্ফুরে বার বার!

বিরাট্ সে পুরুষের ছবি!
বিরাট্ তাহার দেহ, নভকেন্দ্রে উড়ে কেশ,
গভীর সিঁদুর-আভা লভি'!
বয়ান স্ফুরিছে মাঝে, বনান্ত-প্রাকার পর-
বসেছেসে—পদতলে তামসী জাহ্নবী;
তামসী জাহ্নবী কাঁদে ফুলে ফুলে করি সোর
গেছে দিন কোথা গেছে রবি!

সূর্য্য কোথা গিয়াছে ঘুরিয়া
দুঃখের মুখানি হের   গভীর ব্যথায় ওই
রক্তরাগে যাইছে পুড়িয়া !
শুন, সে একটি গাহে গান—
মনে লয় চরাচর,   শুনিয়া সে গীতস্বর
হয়েছে হৃদয়ে কম্পমান !

"আমার সহস্র বাহু ভুবনে গেছিল ছুটে
মোর যত বেশবাস নভে পড়েছিল লুটে !
সারাদিন কলনদী ধুয়ে মোর পদতল
কুসুমিত তীর হানি,' ব'হেছিল নিরমল !
ফুলফল লতা পাখী আমারে ঘিরিয়া সবে
সারাদিন নেচে নেচে ছুটেছিল কলরবে !
লক্ষ নর-নারী প্রাণ গাহিয়া আনন্দ গান
আমারি হৃদয়পরে হয়েছিল লুণ্ঠমান ।
শত মরকত-মাঠে এলাইয়া মহাকায়
মাথাটি হেলায়ে দিনু পর্ব্বত-পাদপ ছায় —
ধরার জীবনরস পশিয়া সর্ব্বাঙ্গে মোর
বিহ্বল করেছে মোরে, সুখমদে ছিনু ভোর !
কোথাছিল দুঃখ হায় ! লুকায়ে ঘুঘুর মত—
সুদূর মরম মাঝে ? - সুখ সে কেমনে হত ?
হায় কি অশুভ পন !
দেবতা কি দুরজন !

ভস্মবৃষ্টি পড়িল ঝরিয়া
নভতল ভস্মে আবরিয়া !
নয়নে পড়িল মোর ছাই
আর কিছু দেখিতে না পাই !
চারিধারে ফিরিছে আঁধার
মাথায় নামিছে গুরুভার !
সাপিনীর ফণাসম তমোফণা তুলি
সহসা কে দাঁড়ায়েছে দশদিক্ খুলি !
আনন্দ শয়ন ছাড়ি, উঠিনু আয়াস ভরে—
থরথর কাঁপে তনু, মাথা ঢুলে ঢুলে পড়ে !
কেবল এ গভীর ব্যথায়
আননে সিঁদুর-রাগ ধায় !
দুরবল পদতলে কাঁদিছে আকুল জল
হৃদয়ের মাঝে শুধু চেয়ে দেখি অবিরল !
সেথা কোন্ ভস্মগিরি চূর্ণ হয়ে উড়ে যায়
সব ম্লান হয়ে আসে ! ভস্মে সব ভস্ম ছায় !
কাঁপিতেছে করপদ, মুহুঃ কাঁপিতেছে শির
হে রজনি, তব শয্যা ঢালো ঘোরা রজনীর !
একটি মরণ সেথা নিভৃতে বিছায়ে দিব—
এ বিরাট দুর্ব্বলতা বিস্মৃতিরে সমর্পিব !
বনরাজী যদি চায়, যেন সে সঙ্গীত গায়
শিয়রে দাঁড়ায়ে মোর রজনীর কিনারায় !

সে মৃত্যুর শান্তিপরে তামসীর চূড়াদেশে
দুচারিটি স্মৃতিফুল হয়তো আসিবে ভেসে
তোমার স্বকর হ'তে, মধুর তারকা রূপে
চারিটি প্রহর ধরি, রজনী সে চুপে চুপে
দাঁড়ায়ে কাঁদিবে একা,—ক্রমে শীর্ণ গণ্ড তার
পাণ্ডুল ললাটে তার চুম্ব রাখি, মেলি দ্বার
বিজয়ী দিবস এসে, টেনে লবে আলোপর—
নীলাম্বরে ঝ'রে যাবে জ্যোতিবৃষ্টি ঝর ঝর!
তারকা চমকি' দিয়া মুছি দিয়া চরাচর
জ্যোতির আনন্দ-গান উল্লসিবে নভোপর।"

এই সুরে সন্ধ্যা ম'রে যায়
কাঁদে বসি বিশ্ববাসী লোক!
মোর প্রাণ ব্যথা-পরিপূর
হইয়ে বিরাট এক শোক
লুটি পড়ে সহস্র ছায়ায়
আরা সনে কাঁদিয়া বিধুর!

—•—

শেলির প্রতি।

কোথা তুমি? কোথা তুমি আজি, কবি মোর?
মৃত্যুস্বপ্ন;—আজি মোর খুলিল নয়ন
অশ্রুধারে ধুয়ে গিয়া—তুমি আছ বাঁচি,
উদ্ভ্রান্ত হৃদয়ে আজি আমি দেখিয়াছি।

কত সকরুণ গান গাইছে কবিরা
সুন্দর শীতল করি' ধরণীর তল—
বড় ব্যথা লয়ে প্রাণে ধেয়ে ছুটে যাই
আলিঙ্গন করিবারে কারুপানে—তার
বক্ষস্থলে বাঁধিয়াছে পাষাণের ভার
সংসারের পদ মান,—তাই আসি ফিরি'
বড়ই বেদনা পেয়ে; গিয়েছিনু আজ
ফিরে এসে কাঁদিতেছি কুটীরের মাঝ।

রাজত্ব রজতভার বাণীরে কি কিনে?
ভোগসুখে সিক্তমূল ফুটে কি কবিতা?
—কোথা প্রাণ? কোথা প্রাণ? ধরাতল ছাড়ি'
প্রাণ কি চলিয়া গেছে মর্ত্ত্য দিয়া পাড়ি
তোমার তরণী সনে?—লয়ে যাও তবে
হে কবি আমারে তব সিন্ধু নিকেতনে!

* * * *

ওই দেখ গৃহতলে কে এসেছে নব
উজ্জল সুন্দর শিশু। পরীগণ আজি
মুহুর্মুহু আসে যায়; এক জন বসি'
সংহরিয়া দীপ্ত পক্ষ বাজাইছে বীণা
শিশুর শিয়র দেশে; একজন আর
স্বর্ণদণ্ড ডুলাইয়া দেহ পরে তার
উড়ে গেল দীপ্তিময়; তৃতীয়া আসিয়া
অশ্রুধারে গেলা তারে স্নান করাইয়া,
মাথা নুয়ে বহুক্ষণ স্নেহে নিরখিয়া
নবীন আগতটিরে,—ধীরে গেল চলি'
সায়াহ্ন-ম্লানিমা যেন পক্ষে জনাইয়া।

* * * *

ধীরে ধীরে বাড়ি উঠে কনক চন্দ্রমা।
কি ক'রে করিব স্তব? মর্ত্ত্য ভাষা মোর
অক্ষম কাতর কণ্ঠ। যদি কবি দিতে
তোমার কনক বীণা—যার তারে তারে
সুন্দরী পরীরা মিলি' রহিত ঘুমায়ে
অপরূপ স্বপ্নে ভোর,—তিলেক ঝঙ্কারে
ছুটিয়া ছাইয়া যেত গগনে গগনে
রূপ রস গান প্রাণ অজস্র ঝাড়িয়া
প্রলয়ের তারাবৃষ্টি সম—যদি দিতে

সে কনকবীণা তব, তবে একবার
ঝঙ্কারিয়া গাহিতাম চরিত তোমার।

তখন আছিল বহু সংগ্রাম সময়
রাজা, প্রজা, অত্যাচার, গর্ব্বিত ও পাপী —
তোমারেও ব্যথা দিয়া চলে যেত তারা
দর্পভরে। কবিবর, কোথা তারা আজ?
যতক্ষণ দিবাকর দিক্‌চক্রবালে
মরত পরশ করি ছিল—ক্ষণকাল—
ততক্ষণ বাষ্পরাশি, তরুহর্ম্ম্যচূড়া
আবরি রেখেছে তারে;—আজি মুক্ত নভে
প্রদীপ্ত উঠিছ তুমি প্রখর গৌরবে।
আজি মোর মনে হয় সেই দূরদিনে
তুমি ছিলে একমাত্র সত্য হুতাশন—
জলিতে আছিলে হু হু শুধু উর্দ্ধপানে,
আপনারে পুড়াইয়া, পুড়াইয়া যত
সংহত সঙ্কীর্ণতারে—তাই তারা হত,
বিলুপ্ত বিলুপ্ত চিরজীবনের মত।

* * * *

কারা তোরা কোলাহল কর পক্ষশির
—"তাহার সে চিত্ররাশি বাষ্পময় শুধু

কোথা তাহে দৃঢ়ভূমি, শৈল সানুতল ?
কোথা তাহে জীবন-নির্ঝর, তরুচ্ছায়া ?
কোথা তাহে গৃহ আছে কোথা দৃঢ়ভূমি ?"
—আয় আয় দেখ চাহি' হোমশিখা পানে
গৃহ নাই, শ্রান্তি নাই, শুধু হোমশিখা
অসীম প্রেমের ভরে কাঁপিয়া কাঁপিয়া
সপ্তস্বর্গাতীত কেন্দ্র লক্ষ্য করি, বেগে
উঠিছে জলিয়া ঘোর ! কোথা দৃঢ় ভূমি ?
কেন চাহ দৃঢ় ভূমি ? এ কি নহে তবে
পাপপুঞ্জ, ক্ষতভ্রষ্ট, দুর্দ্দান্ত, গর্ব্বিত,
নির্ম্মম, নির্দ্দয়, ক্রূর, বিকৃত, অশ্লীল,
প্রেমহীন প্রীতিহীন তোদের ধরণী ?
একি নহে আলোকেরে সরায়ে ফেলিয়া
ভূতের রাজত্ব হেথা বিশ্বে ঈশ্বরের !
—প্রলয়ের বহ্নি আসি' করুক দাহন
চূরে দিক্ পূরে দিক্ ভস্মশেষ ক'রে
তার পরে দৃঢ় ভূমি জাগিবে সুন্দর।

*   *   *   *

সেদিন তরণী খানি, হে কবি সুন্দর,
কোথা তোমা লয়েছিল প্রতীচির কূলে ?
অকূল সমুদ্র-বাহী সুতীব্র ভয়াল
তটিনী স্রোতের বেগে যথা পথমাঝে

শৈলমূলে থাকি' চূরি পাহিয়া গহ্বরে,
আলোক-আলয় হতে প্রবেশি' ছায়ায়
দুদণ্ড বিরাম চাহে—তেমতি তোমার,
সে দিন তরণীখানি, হে কবি সুন্দর,
কোথা লয়ে গিয়েছিল প্রতীচির কূলে ?
সেই সে বিহঙ্গতরী পূর্ব্বতট হ'তে
তোমারে লইয়া গেল শ্যাম দ্বীপ মাঝে—
সেথা ঝঞ্ঝা বহে নাহি,—গোপন নিলয় !
সে গোপন নিলয়ের চারিধার ঘিরি'
কল্লোলে কিরণে ফেণে সিন্ধু মরে ফিরি'
—নিত্য নব নব শোভা চুম্বি' বালুতীর,
তুষারধবল গুহা। বিরাট সমীর
একান্তে ভ্রমিছে তীরে, অম্বুরাশি সনে
উঠিছে পড়িছে নিত্য আপনার মনে।
ঘন বনরাজী মাঝে বনদেব চরে
সেথায় বহু পথলে সরিতে নির্ঝরে
নিসর্গ স্ফটিকসম কান্ত বিশদতা,
অমল প্রভাত বায়ু সম নির্ম্মলতা।
বহুদূর দূর সেথা শৈবাল সরল
(মৃগকুল চরিতেছে নাহি কোন জন)
গহ্বর নিকুঞ্জ কভু দীর্ঘ বনপথ
ভেদ করি' বয়ে যায়। কোথা নির্ঝরিণী

উচ্ছলয়ে বন তুলি' শ্রান্তিহীন ধ্বনি,
মধ্যাহ্নে কোকিলা সনে রাগিণী মিলায়—
সেথা বহে নিত্যকাল সুমধুর বায়।
সে লঘু অমল ব্যোম—যাহে দ্বীপ ভাসে
লেবু পুষ্পগন্ধ যেন গুরু হয়ে আসে ;—
অদৃশ্য বরষাপুষ্ট কুজ্‌ঝটি সমান
পুষ্পগন্ধভার আসি' পরশে নয়ান
সুকোমল সুপ্তিভরে ঘুমায়ে পল্লব।

কবি, সখা, প্রিয়বন্ধু কোন্ সেই দ্বীপে
চেয়েছিলে আপনারে করিতে প্রেরণ
কাহারে সঙ্গিনী করি বিহঙ্গতরীতে ?
কে সে ? কে সে ? বারবার শুধু মনে হয়
কে সে যারে লয়ে যাই সমুদ্রের কূলে,
—রচি গিয়া প্রেমধাম !—একা একা সখা !
একেলা ফিরেছ তুমি ! কবিদের পরে
যেই অভিশাপ আছে, তাই বহি' শিরে,
সঙ্গীতেরে সাথী করি' ফিরিয়াছ একা—
রজনীরে ডাকিয়াছ আকুল আহ্বানে—
গান দিয়া, রাতি দিয়া, অন্ধকার দিয়া
রচিতে চেয়েছ, সখা, যেন অন্তরাল

গূঢ় অমৃতব্যাকুল প্রাণ জুড়াইতে
আত্মবহ্নি শীতলিতে।———

... ...

—————ত্বরা মুক্ত তরী!
আজি স্থির সিন্ধুজলে ঝঞ্ঝা ভয়ঙ্কর
মৌনমূর্তি বসি' আছে কঠিন ললাট,—
এখনি উঠিবে গর্জ্জি'—মন্ত্র জপিতেছে .
সহসা ছুটিল মন্ত্র!—প্রচণ্ড কল্লোল!
অম্বুতলবাসী নাগ লক্ষ উঠে ফুঁসি'!
পাপী যথা পাপগৃহে কক্ষের মাঝার—
দীপ নিভাইয়া ফেলি' আনে অন্ধকার—
তেমতি সেদিন যেন ধরণীর পাপ,
করিবারে পুণ্য হোমশিখা অপলাপ
উঠিল তরঙ্গি গর্জ্জি' চরম আক্রোশে!
হারে মূঢ় পাপ!
কারে তুই করিবারে চাহ অপলাপ!
উর্দ্ধে নিম্নে সঙ্গোপন দেব-নিকেতন—
প্রাণ যেথা খলি' যায়। গভীর বিরাম
মনোরম নীলজ্যোতি অম্বুপতিঘরে
কবিরে জগতমাতা আপনি বসিয়া
করাইছে স্তন্য পান, স্নেহে মুখে চাহি'!

মা, মা, কোথা, বল, তুমি! কোথা ব'সে আজি
তাহারে লইয়া কোলে? ধরণীর জ্বালা
তুমি কি জাননা মাগো? পুঁছ পুত্রে তব!
হায়! সে কি ভুলে গেছে? তবে কি সেথায়
যেতে যেতে সব দুঃখ ব্যথা ভুলে যায়?
তোমার মুখের পানে বারেক চাহিতে
নব জন্ম লভে তারা? কি করিব তবে?
না, না আজো আসিবে সে! এই দেখ হেথা—
এই যে আগুণঘেরা পর্ব্বত-সমান—
রেখে গেছে কবি তার মর্ত্ত্যের পরাণ
উদার বিপুল ছন্দে চিররুদ্ধ করি'।
এই জ্বালা, এ সৌন্দর্য্য, অশ্রুনিকেতনে
পশিয়া আকুল আমি কিরিতেছি কাঁদি'—
নিশ্চয় হেথায় সেই অদৃশ্য দেবতা
শুনিছেন ক্রন্দন আমার! কবি, সখা,
ব্যথিত পরাণ! বড় ব্যথিত পরাণ!—
এস কর আলিঙ্গন,—তব স্রস্ত কেশ
অনুভব করি মোর ললাটে কপালে,—
তব উন্মাদন নেত্র নেত্র পরে মোর
একান্তে স্থাপন করি! বল, মোরে বল
সেই সিন্ধু অতলের জননীর কথা!

ওকি মুক্তা তব ভালে ? কে দিয়াছে উহা ?
শঙ্খ শুক্তি সুন্দরীরা গাঁথে সেথা মালা ?
এস এস ! বড় আজি ব্যথিত পরাণ !

—*—

বর্ষা-রাত্রি ।

আজি অন্ধকার শূন্যে ব্যাপ্ত বরষণ !
গগনের মহাচ্ছন্দে বিশ্রব্ধ সঙ্গীত—
একমাত্র সখা তার বিরাট পবন
এলাইছে তরুপুঞ্জে শ্বসিত সম্বাদ
দুলিয়া দুলিয়া আজি নড়ে চারিভিত ।
কতদূর ব্যাপিয়াছে এ ঝর্ঝর নাদ ?
কোথা উড়িয়াছে মেঘ ? কোথা চারিদিক ?
সিঞ্চনমোদিত মোর তরুভ্রাতাদল
করে বুঝি জয়নাদ, শৈল অনিমিখ্
কটিতটে হস্ত রাখি হৃদয় চঞ্চল,
নদ নদী সরিতেরা আস্ফালিয়া নীর
চঞ্চল শুণ্ডের মত হর্ষে হানে তীর !
গৃহে আমি ; বর্ষাগর্জ্জ ব্যোমে নিরখিয়া
ক্রন্দিছে মুদিছে প্রাণ হৃদয় হানিয়া ।

—:—

চণ্ডালী।

১

"হায় মা, একি মা, আজি একি হ'ল, একি হ'ল তোর—
মুখে অন্ন নাই, নিশি কেঁদে কেঁদে করে' দিলি ভোর।
দেখ, বরষার রাতি গরজি বরষি হ'ল শেষ—
এখনো—এখনো মাগো পড়ে' আছ আলুথালু-বেশ?
কোন্ মণি কোন্ সোনা কারে দাস কারে চাও দাসী—
বল কে সে—বল কি সে—এই দণ্ডে নিয়ে তারে আসি।
জানিস্ নে মা তোহার কত গূঢ় তন্ত্রমন্ত্র জানে—
মানস করিলে—ধরা নিমেষেতে পদতলে আনে?"
—কহিলা চণ্ডালী-মাতা, অম্বিকারে,—কন্যারে সম্ভাষি'—।
(মাতা ও তনয়া দোঁহে বৈশালীর প্রান্তগ্রামবাসী)।
অম্বিকা চণ্ডাল-বালা—কোথা হ'তে পেল এত রূপ—
মোহানিয়া এ চিকুর, এমন নয়ন রসকূপ?
এমন কপোলযুগ লাবণ্যললিত ঠোঁট-দুটি
এমন মোহন গ্রীবা—অনঙ্গের যেন ফুল-মুঠি?
অলাজে বিচরে বালা সঙ্গিসাথে বাহিরে কি ঘরে—
কিংবা রঙ্গময় ছাঁদে পা-দুটি মাটিতে তার পড়ে!
হাতটি বেড়িয়া তার বলয় নাহিক একখানি—
অভূষণ এ রূপেরে বড় আমি ভয়ঙ্কর মানি!

একি এ বলয়বন্ধবিমুক্ত, প্রমত্ত রূপোচ্ছ্বাস—
এ যেন চুম্বিতে চায় বায়ুবহ সকল আকাশ।
প্রত্যেক চরণপাতে তালে তালে বাজিয়া নূপুর
উহার গতিরে কভু করে না ত সরম-মধুর!
ওই কণ্ঠতট হতে বিলম্বিয়া মণিময় হার
বক্ষোচ্ছল যৌবনেরে লাজ নাহি দেয় একবার!
বৈশালীর প্রান্তমাঠে বটমূলে বেণুকুঞ্জতলে,
ময়ূরচরিত পথে এ কিশোরী যত ফিরে চলে—
বেশ নাই, ভূষা নাই—এলোকেশ, মলিন বসন—
চমকি' সবাই কহে—"চণ্ডালী এ?—কি জানি, কেমন!"
চণ্ডালী জননী তার কন্যারে নেহারি দেখে যত,
চোখে তার আসে জল, ভাবে—"হায় ব্যথা পেলি কত!
কোন্ যক্ষবালা তুই আইলি এ দীনহীন ঘরে—
শৈশবে হারালি বাপে, কত কষ্টে দরিদ্রার ক্রোড়ে
বাড়ি' এমনটি হ'লি!—মরি মরি—একি রূপ মা'র!
এ ল'য়ে কোথায় যাব?—রেখে দেব হৃদয়ে আমার!'
—ভাবি' ভাবি' হিয়া গলি', নিঠুরা সে চণ্ডালিনী কাঁদে—
যতই স্বামীরে স্মরে অশ্রু আর কিছুতে না বাঁধে।
আলো প্রৌঢ় চণ্ডালিনি কি যে তুই গেলি দরবিয়া—
পরুষা পুরুষ হতে! কোদালি ও ঝুড়ি কাঁধে নিয়া
বৈশালীনগরশেষে প্রান্তরে ভ্রমিতি তুই যবে,
কপাল সিঁদুরে ভরি, তোর নব-যৌবন-গরবে—

রাখাল-কিশোর যত বাঁশরী-বিলাস বন্ধ করি'
ভীরুতায় ধীরে ধীরে বাঁশবন-আড়ে যেত সরি' !—
প্রতিবেশী যত—তোর ভয়ে সদা ছিল কম্পমান—
কন্যার স্নেহ-সোহাগে একি তোর দ্রবি' গেল প্রাণ ?
শত আবদারে বালা জননীরে যত উদ্বেজিছে—
স্নেহমূঢ়া চণ্ডালিনী সব-কিছু জোগায়ে আনিছে।—
সেই সে অম্বিকা আজি কি লাগিয়া করে' অভিমান
ভূমিতলে পড়ে' আছে ?—চণ্ডালীর বাহিরায় প্রাণ !
"উঠ উঠ মা আমার, উঠ উঠ হৃদয়পুত্তলি"—
কন্যার শিয়রে বসি' সাধিতেছে শত কথা বলি'।
ত্বরা উঠি' কাঁদি' হাসি' করতলপিঠে আঁখি মুছি'
কহে বালা অভিলাষ—প্রভাতের রবিরশ্মিরুচি
মাটির দেয়াল'পরে খড়ে ঢাকা জানালার ফাঁকে
পড়িল আসিয়া মুখে, অভিমানে রাঙা চোখে-নাকে,—
বিস্রস্ত চূর্ণচিকুরে, রাঙা-দুটি-অধরোষ্ঠ'পর
—(উপবাসে ক্ষীণ হ'য়ে যাহা আরো হয়েছে সুন্দর)—
—জানাইল আবদার—"মাগো, আমি গিয়েছিনু কালি
যে পথে তোমরা যাও মাঠ এড়ি' নগর বৈশালী—
বটতরুটির মূলে, কূপ হ'তে তুলিবারে জল।—
দারুণ মধ্যাহ্নবেলা, পুড়ি' যায় যেন নভতল—
কলসিটি ভরে' আমি ধীরে ধীরে রাখিয়া পাষাণে
চাহিয়া দেখিতেছিনু ছায়াভরা-বটপাতা-পানে

ঊর্দ্ধদিকে—কচি কচি হইতেছে কোথাও বাহির,
কোথাও সবুজ-গায় শতপাতা ঘেরি' একনীড় !—
কিছুই ছিল না মনে—সহসা তৃষায় হাহা করি'
এক ভিক্ষু মহাজন এসে প'ল উঠিনু শিহরি' !
একি রূপ মরি মরি ! একি রূপ আগুনসমান—
তৃষায় শরীরখানি মুহুমুহু তাহে কম্পমান—
ঠিক যেন বহ্নিশিখা !—মাগো, আমি তৃষা তাঁর ভুলি'
রহিলাম চাহি' শুধু দুনয়ন প্রাণপণ খুলি'—
আহা !—চমকিয়া শেষে অঞ্জলিতে ঢেলে দিনু জল—
হাসি', আশীর্ব্বাদ করি' চলি গেলা হইয়া শীতল !
—চলি গেল ? হায় মাগো—চলি গেল ? চলি গেল দূর ?
আর ফিরিবে না সে কি ? যাব আমি তাহাদের পুর !
নাহি মোর লাজভয়—চিনি আমি বনপথ চিনি,
এখনি যাইব সেথা—যাই, আমি যাব একাকিনী—
অথবা মা, তোর সেই মন্ত্র মোরে দেগো শিখায়ে যে।
সারারাত্রি জাগি' জাগি' মন্ত্রে তারে আনিবই বেঁধে !"
—জননীর দুই হাত দৃঢ় চাপি' বসিলা অম্বিকা !
চণ্ডালিনী কহে—"হায়, নাহি জানি কি কপালে লিখা !—
তারা যে সন্ন্যাসী ভিক্ষু মহাজন দেবতাসমান,
সমস্ত সংসার তাঁরা নিমিষেতে করে তুচ্ছজ্ঞান—
কি মন্ত্রে তাঁদেরে বাঁধি ? বাঁধিলেও, হায় অভাগিনি,
ভিক্ষুর ভাঙিবি ব্রত ? হ'বি ঘোরনরকগামিনী ?"

"অযুত নরকে যাব"—কহিলা কিশোরী গরজিয়া—
"একবার তাঁরে শুধু এ ভুজবন্ধনমাঝে নিয়া
যাব যেথা যেতে হয়, শিখায়ে সে মন্ত্র ত্বরা করি'।"
দাঁতে দাঁত চাপি' মাতা বসি' রয় কতক্ষণ ধরি'।

ধরার ব্যথায় ব্যথী ওই হের বসি' আছে সব—
বৈশালীর বেণুবনে বুকে ঘিরি' স্তম্ভিত-নীরব!
বৃহৎ হৃদয়গুলি অধীর বৃহৎ বেদনায়—
হোথা ক্ষুদ্র তৃষালোভ বিকার কভু না স্থান পায়!
আজি ঝঞ্ঝা বহিতেছে গরজবিদ্যুতজলে মাতি—
আজি যথা নভস্তলে হুঙ্কারিছে পাগলিনী রাতি—
তবু তার মাঝে সবে বুকে ঘিরি' বসি' আছে স্থির—
তেমনি ওদের হিয়া অকম্পিত ঝড়ে পৃথিবীর!
ক্রূর হানাহানি দ্বেষ, যজ্ঞভূমে পশুঘাতমত
লোকনিপীড়নমাঝে—উঁহারাই শুধু শান্তিব্রত!
—সে শান্তি জগতজনে দীনতমে দিবে বিলাইয়া
কি বৃহৎ করুণায় পরিপ্লুত ওই শত হিয়া!
—অনাথপিণ্ডিক হেথা, হোথায় আনন্দ মহাপ্রাণ—
চৌদিকে কতই আর, ধ্যানমগ্ন, স্তিমিতনয়ান—
বৈশালীর বেণুবনবিহারে বোধিসত্ত্বেরে ঘিরে'
বসে আছে স্তব্ধ হ'য়ে—গরজিছে ঝটিকা বাহিরে!

—একি ?—আনন্দের মনে সর্ব্বনাশী কি এল বিকার ?
নীরব সে সজ্যসনে হিয়া নাহি মন্ত্র জপে আর !
লালসার একি বহ্নি জ্বলি' ওঠে হৃদয়ের মাঝে
সে আলোকে উদ্ভাসিতা অনিন্দিতা এ কে চিত্তে রাজে ?
—সেই বটতরুমূল, আভরণহীনা সেই ছবি,
সেই চমকিত চোখ !—নিখিল পুড়িছে—দীপ্ত রবি—
তার মাঝে বটচ্ছায়ে তৃষাতুরে করে জলদান—
বহ্নিবর্ণে কে লিখিল নিদারুণ এই ছবিখান
ভিক্ষু আনন্দের বুকে ! দাঁতে দাঁত ঘরষি' সন্ন্যাসী
নিজমর্ম্ম হ'তে যেন আক্রোশে উৎসারি' রক্তরাশি
চাহিল ভুলিয়া যেতে !—হায় !—শেষে সংঘসভা ছাড়ি
কোথায় আনন্দ চলে সেই অন্ধঝটিকা বিদারি' !
হাহা করি' চারিদিকে লোটায়ে পড়িছে বেণুবন—
বিশ্ব দাবাইয়া নভ বারবার করে গরজন—
আপনার সঙ্গে বুঝি' তেমনি ঝটিকা বুকে ধরি'
আনন্দ, প্রান্তরপথ চলিছেন অতিক্রম করি' ;
শাখাপত্র ওড়ে মুখে, ত্রিবস্ত্র বাহিয়া পড়ে নীর—
কি টানে চলিছে ভিক্ষু অম্বিকার সুদূর কুটীর !

হেথা হের চণ্ডালিনী কোন্ যজ্ঞ জ্বালিয়া কুটীরে,
পরি' এক বাঘছাল, রক্তসূত্র জড়াইয়া শিরে,

জানু পাতি' বসিয়াছে, পড়িতেছে মন্ত্র ভয়ঙ্কর—
সম্মুখে কেহই নাই। মা গেছে সরিয়া দূরপর!
একাকিনী অম্বিকা সে পত্ররাশি বহ্নিমাঝে ছাড়ি'
দু'হাতে চাপিছে বক্ষ যেন হিয়া দেবে বা উপাড়ি'—
সহসা করুণা একি চিতে আসি' পশিল তাহার—
কহে চিত—"ওই, ওই,—আসিতেছে, দেরি নাই আর!
ওই শুন ঝঞ্ঝামাঝে!—পদধ্বনি মৃদু মনোহর—
ও বুঝি বাজিছে মোর গূঢ়তম মরমভিতর!
আহা, আমি কিবা দিয়া বরিব হৃদয়রাজে আজি?
এ মোর ভৈরবীবেশে?—না না, এই ফুলদলরাজি,—
শিরোভূষা, কর্ণভূষা করি' লই!—থাক্ সেও থাক্—
রব আমি চক্ষু মুদি' ভূমিতলে বসিয়া অবাক্,
করজোড়ে!"—মুখখানি বুক'পরে পড়িল ঢলিয়া—
ব্যগ্র আরাধনাভরে কাঁপে হিয়া হানিয়া হানিয়া—
এমনি সঘনে বুঝি কেঁপেছিল আদি অন্ধকার
পূর্ব্বক্ষণে জ্যোতির্ম্ময় এ বিশ্বভুবন ফুটিবার।
অকস্মাৎ মুক্তদ্বারে দীর্ঘমূর্ত্তি দাঁড়াইল আসি'—
ভ্রুকুটি-ভীষণ-মুখে "কি করিলি?" গর্জ্জিলা সন্ন্যাসী।
"কি করিলি?"—বিদারিত মরণের ক্ষোভে তীব্রস্বর
বিচরিল গৃহমাঝে শব্দময়ী ঝঞ্ঝার ভিতর!
অন্ধকারে আত্মহারা তরু যবে থাকে দাঁড়াইয়া—
কে জানে কেমন করি' রুদ্ধভায় কাঁপে তার হিয়া—

অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্র আসি' পড়ে শিরে তার,
পুড়ায়ে দীরিয়া ফেলে, তেমনি বাজিল অম্বিকার।
মুহূর্ত্ত নীরবে চাহি' চমকিয়া দাঁড়াল অম্বিকা—
"হায়, আমি কি করিনু, কি করিনু—এ যে বহ্নিশিখা!
এরে আমি মোর হীন অন্তরের কালিমাখা মেঘে
ঢাকিয়া ফেলিছি কিরে?" হানে বক্ষ নিদারুণ বেগে!
চকিত নয়ন স্থির, দুই বাহু তুলে' স্পন্দহীন
দাঁড়াইয়া রহে নারী পুত্তলিকা যেন চিত্রলীন।
মর্ম্মে বাজে হাহাকার বিশ্বজোড়া বিয়াকুলধ্বনি—
"হায় হায় কি করিনু!—কি করিনু!—জগতের মণি
কোন্ মহাব্রতজনে পথচ্যুত করিলাম আমি।"
হৃদয়-ক্রন্দন-সনে বাহিরের ঝঞ্ঝাময়ী যামি'
সুর মিলাইয়া দিল—অম্বিকা তাহাই শুনে কানে—
দাঁড়ায়ে নিস্পন্দদেহ—মূর্ত্তি যেন অঙ্কিত পাষাণে!
"কি করিনু!—কি করিনু! হে তরুণ যতি মনোহর—
মোর বাসনার টান লাগিছে কি তব হিয়া'পর?
কি করিনু!—কি করিনু! হায়, আমি কেমনে আমায়,
দিব তব পদতলে?—এ যে হিয়া ভস্ম লালসায়!"
অম্বিকা দাঁড়ায়ে রহে—হেথা শান্ত হ'য়ে এল ঝড়,
আর না ডাকিল বায়ু—শিথিল বরষা ঝরঝর—
শীতল পরশে কোন, ধীরে ধীরে এল জুড়াইয়া
অম্বিকার হিয়াতল—কহিল সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া—

"কোথা ? দেব, কোথা ফুল ? যেতে হ'ল ফিরে যেতে হ'ল
আজ ফিরে যাও যতি যাব আমি তব পদতল !
ফুল ফুটাইব আমি এ হৃদয়ে বিজন সাধনে—
এ হৃদয়পুষ্প ল'য়ে সেইদিন যাব আরাধনে !"
অম্বিকা দাঁড়ায়ে র'ল—পদতলে ধরণী তাহার
আর না টলিছে যেন !—খুলি' পড়ে কেশ বালিকার !
বরষা থামিয়া গিয়া একা বায়ু জাগিল তখন,
দ্বার খুলি' অম্বিকার বক্ষবহ্নি নিভাল পবন !
অন্ধকারে এলোমেলো উড়ে তার কুন্তল-অঞ্চল
দু'চোখে দ্বিগুণ ধারে অম্বিকার বাহিরিছে জল !

—•—

জামদগ্ন্য।

"একরথে মন্ত্রী সহ পরিষৎ সহ
ঋষিসঙ্ঘ সঙ্গে রাজা, আগিয়ে চলহ—
চলুক্ একেক রথে একেক কুমার—
নববধূ সঙ্গে লয়ে পশ্চাতে তোমার।"

"তাই হোক" বলে রাজা। সে প্রভাত বেলা
বিদেহ ছাড়িয়া চলে অযোধ্যার মেলা!
শত শত চীনাম্বরে রথাগ্র চূড়ায়—
হাজার কপোতী যেন উড়িয়া বেড়ায়!

বাজায়ে বাঁশরী শঙ্খ শৈল সরণায়—
মূক পাহাড়েরে আজি তাহারা জাগায়,—
চমকি পাহাড় শত ধ্বনি দেয় ফিরে—
রামচন্দ্র সীতা লয়ে আসিছেন ফিরে?

"রামচন্দ্র সীতা লয়ে অযোধ্যা চলয়—"
সে চতুরঙ্গিনী সেনা গরজিয়া কয়—
হ্রেষি উঠে বাজীরাজি, গর্জ্জে গজকুল
অযুতে উঠিছে নাদি গোসঙ্ঘ তুমুল।

কুমারের রথে রথে মিলি সখীজন
সুখের বুকের তীব্র সুখের মতন
সে গর্জ্জনির্ঘোষ মাঝে হুলু হুলু করি
কাঁপায় গগন,—উঠে কানন শিহরি'—

অমনি ঝরিয়া পড়ে পথতরুফুল!
দেবতাচঞ্চলপদে আকাশ আকুল।
দিকে দিকে নাচি উঠে দিগপ্সরীদল
সুরভি সমীরে সারা আকাশ পাগল!

শৈলশিরে মৃগব্যাল ব্যাঘ্র আসি' স্থির—
দাঁড়ায় সমুখ পানে বাড়াইয়া শির!
এ উৎসব-আশীর্ব্বাদ—পুষ্পবরিষণ
লইছে মস্তক পাতি সমস্ত ভুবন।

অগ্ররথে দশরথ শত ঋষিসনে
কল্যাণ সুস্মিত মুখে মগ্ন আলাপনে!
কথা—রামকথা, স্নেহবিগলিত প্রাণ
সহস্র আশীর্ব্বচন সহস্র কল্যাণ!

একরথে রামসঙ্গে জানকী সুন্দরী
বসিয়াছে বিবাহের রক্ত বাস পরি'—

প্রাণে প্রাণে সুজনার কথা ধ'রে যায়
সর্ব্বাঙ্গে মধুর মধুরস উছলায় !

সুজনার চক্ষু দুটি মৃকপক্ষী সম
এ ওরে চাহিয়া আছে ! ওহে রঘুত্তম
হে বীরেন্দ্র, আজি তুমি কোন্ পুণ্যনীরে
করিবে অবগাহন যৌবনের তীরে ?

অকস্মাৎ দশরথ কহে "পুরোহিত
একি দেখি ? হে বশিষ্ঠ একি বিপরীত ?
ঘোর রবে পক্ষীকুল ফুকারে আকাশে,—
চারিধার অন্ধকার হ'য়ে যেন আসে,—
মৃগদল ত্বরা শৈল সানুতল ছাড়ি—
মোদের সম্মুখ পথ যাইছে উত্তারি' ।

গরিষ্ঠ বশিষ্ঠ কহে "নাহি নাহি ভয়
পক্ষীর অশুভ চিহ্ন কাটে মৃগচয়"
বলিতে বলিতে বায়ু নাড়ি' ধূম্র শির—
দূরের দিগন্ত হ'তে হইল বাহির !

অযুত মেঘমাতঙ্গ আকাশের পর
ধাইয়া ছুটিয়া এল ! "একার সমর ?"

দশরথ কাঁপি কহে "সংহর বরুণ
"সংহর সংহর দেব রোষ নিদারুণ!

"প্রসীদ মরুৎগণ হাস রুদ্রগণ,—
যজ্ঞাগ্নি সহস্রশিখা করিবে বহন
ষোড়শোপচার হব্য তোমাদের পানে,—
বধিও না বধিও না আমার সন্তানে।"

প্রলয়ের তুরঙ্গম কে আসিছে ওই?
কোন্ উচ্চৈঃশ্রবা—ক্ষুরে ভস্ম উৎসরই?
ঢাকিল রাঘবী চমূ নিবিড় তিমির!
মূর্চ্ছিত চতুরঙ্গিনী! কে আছেরে স্থির?

শুধু রাজা, ঋষিগণ, কুমারেরা আর
হেরে তারা,—অন্ধকার করি অন্ধকার
জগতের কাল রাত্রিসম ভয়ঙ্কর—
মস্তক তুলিয়া কেবা হয় অগ্রসর!

জটার তমিস্রতলে চাকচিক্য ধরে—
পুঞ্জিত বিদ্যুৎ রাশি—মুনিস্কন্ধপরে
—বিশ্বনাশ আনন্দের যেন অট্টহাসি!
—সেই সে কুঠার ক্ষত্রশোণিতপিয়াসী!

ডাক্ দিয়া গরজিয়া আরম্ভিলা মুনি
—"বড় আজি গুণপণা দেখাইলে গুণী
জীর্ণ শীর্ণ শত চাপে লুলিত কাতর
হয়াযুধে গুণ দিয়া! —হও অগ্রসর—

"এসো হেথা চলি কাছে, বৈষ্ণব এ চাপ
ইথে গুণ দাও দেখি,—বুঝি বীর দাপ!"
—চরিল গম্ভীর রব আকাশের পর—
গড়ায়ে গড়ায়ে—যেন অশনির স্বর!

দশরথ করযোড়ে, ত্রাসে ডাকি কয়—
"ক্ষান্ত কর, ক্ষান্ত কর আজি মহাশয়,
গো কোটি অযুত অশ্ব দিব তোমা দান,
মুনিবর ক্ষান্ত হও, কর অবধান!"

ততক্ষণে রামচন্দ্র ঘুরাইয়া রথ
আসিয়া আগুলিয়াছে জামদগ্ন্যপথ!
"কোথায় গাণ্ডীব তব?" "এই হেথা লও"
"হে গাণ্ডীব, শুন কথা, অবনত হও"

স্ফুরিয়া স্ফুলিঙ্গ রাশি কড় কড় স্বরে—
রামআকর্ষণে ধনু অবনমি পড়ে—

গরুড় নাসিকা সম বক্রধনু খানি
দীপিছে বৈষ্ণব তেজে, অন্ধকার হানি !

দীপ্তিতে প্রকাশ লভে রঘুত্তমবীর—
প্রদীপ্ত আনন তার প্রদীপ্ত শরীর !
ধনু যেন লুটাইয়া পদতলে তার—
গরবে তুলিছে শির—একি চমৎকার !

'একি চমৎকার' বলি মুনি আরম্ভিলা
যদিও সেথাই মুনি দাঁড়ায়ে রহিলা,
—ভাঙিয়া পড়িল যেন জানুদ্বয় তার—
জীর্ণ স্বরে আরম্ভিলা "একি চমৎকার !

"চমৎকার ! মহাশয় চিনেছি তোমায়
পূর্ণ ক্ষত্রতেজ আজি উদিল ধরায় !
আমার কুঠার লয়ে বিদায় এবার—
যাই সে:মহেন্দ্র শৈলে সমুদ্রের পার !

"আমিও তোমারি নাম—'রাম' নাম ধ'রে-
আবির্ভূত হয়েছিনু ধরণীর পরে—
জলদা নদীর তীরে ভোজকট বনে
আমিও মাতিয়া ছিনু সহস্র স্বপনে—

"শৌর্য্য বীর্য্য সৌন্দর্য্যের সহস্র স্বপন
আমারো বালকহৃদি করিয়া কম্পন
চক্ষে ফুটাইয়াছিল আনন্দ আলয়
আশার প্রদীপে—আজি সব মনে হয়।

"আজি যেন জীবনের সর্ব্বশেষক্ষণ
সমস্ত এ জীবনের অধীর স্পন্দন
একটি মুহূর্ত্ত মাঝে যেন লভিলাম
দাঁড়াও ক্ষণেক! শুন রঘুপতি রাম!"

হেথা বাষ্পে ছেয়ে এল সমস্ত আকাশ
বিশ্বের শিয়রে যেন বৃহৎ নিরাশ
বর্ষিতেছে বাষ্পরাশি! তমিস্র গভীর
তাহে এক শব্দ উঠে—"শুন রঘুবীর

"ভেবেছিনু নর্ম্মদার তীরে তীরে বসি
বিশ্বের আনন্দ ধারা এ হৃদয়ে পশি
মাতায়ে রাখিবে মোরে অন্তহীন কাল
আমি শুধু গেঁথে যাব আনন্দের জাল।

"ভেবেছিনু তপস্যার মূর্ত্ত কালানল
নখরখর্পরধারী রাক্ষসই কেবল!

তার ধ্বংস তার শেষ মোরি হাতে হবে
শান্তিআশীর্ব্বাদধারা বরষিব ভবে !

"কিন্তু হায় ! কিন্তু হায় ! বিধাতা কঠিন
আমাদের ইচ্ছা আশা সবি অর্থহীন !
চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের সলিলবিহার
কুক্ষণে দেখিলা মাতা। হায় রে কুঠার !

"মুছিল আনন্দ মোর চিরদিন তরে—
তার পরে যেতে হ'ল বছরে বছরে—
রক্ত নদী সন্তরিয়া ! হেরি অত্যাচার
ক্ষত্র তেজে ভর করি' লভিছে প্রসার !

"সমস্ত পঞ্চকে পঞ্চ রক্ত সরোবর
রচিলাম,— তর্পিলাম তাহার ভিতর
পিতৃগণে ! শুন রাম ! শুন মনদিয়া
আমিও মানুষ—মোরো মানুষের হিয়া !

"সর্ব্ব ভূমি দান করি কশ্যপ মুনিরে—
সকল ছুঁড়িয়া ফেলি,—হৃদয়ের তীরে—
বলদর্পকুঞ্জ শূন্য-প্রেম হৃদিতটে
সেদিন মহেন্দ্র মাঝে বসেছিনু বটে !

"সেদিন দক্ষিণ সিন্ধু দিতেছিল তাল
আমার চরণতলে উগরি' পাতাল
শৈলজঙ্ঘে বাহু রাখি' শৈলকন্যা প্রায়
সেদিন কাঁদিয়াছিনু সূর্য্যাস্ত বেলায়!

"কেঁদেছিল সর্ব্বপ্রাণ রক্ত রশ্মি আর
সাগর গরজ সনে – শিরে শৈলভার—
ঝুঁকিয়া ভাঙিয়া পড়ে হেন মনে লয়!
তার পরে চলিলাম দূর করি ভয়—

"যদি বলে হয়ে থাকে জীবনের শেষ—
নাহি ছিল তার মাঝে অন্যায়ের লেশ
আমারো এ কুঠারের ধূমকেতুজ্বালা
গাঁথিবে ধরার তরে মঙ্গলের মালা!

"কিন্তু 'আমি' মরে যাই—মরি যে ক্ষুধায়!
'আমারে' কুশল বাণী কেহ না শুধায়
প্রাণ শুধু কবি ছুটে যেথা অত্যাচার—
করে শুধু আস্ফালিয়া উঠে এ কুঠার!

তপস্যায় যাব বলি চলিলাম তবে!
জীবনের আনন্দের স্বাদ পেতে হবে!

রকত স্বপনে কিরে ফুরাবে জীবন ?
সমুদ্র সয়ায়ে যোগে বসিনু তখন !

"বসিনু বসিনু ব'সে...কত কত কাল
সমুদ্র ধ্বনিছে কানে একই রুদ্রতাল !
কি জড়ত্ব ! এই জাল কবে বা ছিঁড়িবে ?
ব্রহ্মরন্ধ্রে শিবজ্যোতিঃ কবে উল্লসিবে ?

"ভাঙিলনা ভাঙিলনা ! ব'সে ব'সে আছি
কোন্ ঋষি কোন্ দেব কার দ্বারে যাচি ?
সমুদ্রের পরপারে শুভ্র অশ্বটিরে—
কদ্রুনন্দনেরা নিত্য রাখিয়াছে ঘিরে !

"তাই আজি শুনিতেছি ধনুর্ভঙ্গ স্তব—
আবার আসন টলি উঠে অভিনব !
—আবার কি ক্ষত্র তেজ করে অত্যাচার ?
কোন্ ক্ষত্র ধনুর্ভাঙ্গে গুরুর আমার ?

"এবার গর্জ্জিল সিন্ধু অপূর্ব্ব আরাবে !
ভীম উর্ম্মিপটলের আন্দোল আহবে
এবার শঙ্খের স্বরে কি পশিল কাণে
কি যেন নীলাভা গেল চমকি নয়ানে !

"কণ্ঠ মোর বারম্বার ভরি উঠে স্তবে
ভাবিনু না জানি তবে কিবা আজি হবে !
সুন্দর কিংশুক দ্যুতি তব রথ ঘেরি—
—বুঝিলাম ! বুঝিলাম রাম, তাই হেরি !

"শ্রেষ্ঠতর বীর আজি মহত্তর জন
সন্ত্রস্ত পৃথিবী পরে কৈলা পদার্পণ !
ধরণীর শত্রু বধি জয়ী হবে বীর !
পরাজয় হবে তব—প্রেমে ধরণীর !

"ঘোর দুঃখে বিজড়িত মলিন, পিঙ্গল
মানব জীবন ! মাঝে তবু অবিরল
আনন্দ জ্যোতির ছটা—বৈশ্বানর দ্যুতি
সকলি জানিবে তুমি হে রাঘব পতি !

"শ্রেষ্ঠতর বীর আজি মহত্তর জন
ভয়ার্ত্ত পৃথিবী পরে কৈলা পদার্পণ !
চিনেছি হে মহাশয়, চিনেছি তোমায়
পূর্ণ ক্ষত্রতেজ আজি উদিল ধরায় !

"বিশ্বামিত্র ব'সেছিল তোমারি লাগিয়া
আমিও তোমারি তরে ছিলাম জাগিয়া !

গেছে সে তাহার ধাম ! বিদায় আমারো
মহেন্দ্রে উড়ায়ে মোরে ছাড়ো তীর ছাড়ো !"

অকস্মাৎ উড়ে গেল অগ্নিমুখো তীর—
কক্ষচ্যুত তারা যেন কালো যামিনীর—
অন্ধকার সরি যায় পিছে পিছে তারি—
চতুরঙ্গ চমূ হ'তে মোহ যায় ছাড়ি !

বিস্ময়ে অযোধ্যা চলে পুনঃ যাত্রীদল
দুধারে আবার জাগে শৈল সানুতল
আবার চলিয়া আসে প্রান্তর অপার—
আবার সে দীপ্ত দিবা ভাতে চারিধার !

বিশ্রাম করিছে হাসি রঘুপতি রাম
বসেছে সীতা সুন্দরী উজলিয়া বাম !
চৌদিক মাতায়ে নামে পুষ্পবরিষণ
হুলু হুলু ধ্বনি দিয়া উঠে সখীগণ !

—•—

দ্বিগুণ তন্ত্রী।

একটি দ্বিগুণ তন্ত্রী মোর বক্ষ মাঝে
রেখেছি পৃথক্ করি যত্নে ছুটি গুণ।
লেহি, লেহি, দানবের তৃষ্ণা যবে নাচে
উদ্দণ্ড উল্লাসে নাচে স্বার্থ প্রেতকুল—
মহামারী ক্ষুধা আর হানাহানি খুন—
এক তন্ত্র সংসারের ঝঙ্কনে আকুল।

আর তন্ত্রে জগতের কোমল অঙ্গুল
স্তব্ধতার তীরে বসি' বাজায় রুণ্ঝণ
শাখা হ'তে মৌনমূঢ় ঝরে যেই ফুল
তারো ইতিহাস লেখা বাজে সকাতর।

তুমি এস, অয়ি সৌম্যে, সন্ধ্যাকূল হ'তে
লঘু হাস্যে স্নধা ক্ষরি তব দৃষ্টি স্রোতে।
বাজুক্ সে চারু তন্ত্রে মন্তর সমান
তব মৌনাধর স্ফুট পুষ্প-পরিত্রাণ!

—•—

আত্মসমর্পণ ।

তোমার চরণমূলে কুণ্ডলিয়া রব—
সুখ দুঃখ হর্ষ আশা দৈন্তে নোয়াইয়া,
ধীরে ধীরে গর্ব্ব ভাঙ্গি লুটাইব হিয়া !
তুমি দিও পাদস্পর্শ নিত্য অভিনব !
নিত্য মোরে জাগাইও বিমল প্রত্যুষে—
শিশিরের বিন্দুসম—শষ্পে লম্বমান—
এক ফোঁটা অশ্রু যেন ;—কোরো অবসান
নিত্য মোর—দুদণ্ডেই তব তাপে শুষে ।
—তবু মোর সুখদুঃখ হর্ষ আশা রাশি
তোমার চরণ মূলে হারাইয়া গিয়া,
কখনো কি উঠিবে না সহসা ফুটিয়া
ঝলমল স্বর্ণ গাদাসম ? মোর হাসি,
মোর অশ্রু—সব, যাহা দিনু তব পায়ে
প্রেম কি গো জাগাবেনা ভুবনে ফুটায়ে' ?

—০—

সুন্দরী।

হে সুন্দরি! তুমি কি গো গরবে নিষ্ঠুরা?
তোমার সৌন্দর্য্যগর্ব্বে নিরত বিমূঢ়া?
ছি ছি মুগ্ধে! মনে করি দেখ একবার
প্রেমের পূজায় কোন্ আত্মসমর্পণে
লভিলে অনিন্দ্য এই সৌন্দর্য্য তোমার!
মনে পড়ে? কোন্ আত্মহারা আলিঙ্গনে
এ বাহু সৌষ্ঠব গোল উঠিল ভরিয়া?
সৌম্য জ্যোতি এ ললাট কোন্ প্রণতির?
কোন্ পাদ বিমোচন গৌরব স্মরিয়া
লম্বিত এ কেশদাম কালিন্দী গভীর?
সে কোন্ বিস্ময়ময় আনন্দ-অর্চ্চন
কি গভীর অশ্রুধারা গড়িল নয়ন
আকুল তরলোজ্জ্বল? সর্ব্ব সমর্পণে
পরিপূর্ণ পদ্মসম ফুটেছ যৌবনে!

—০—

নিশায়।

নিশীথে সে মোর বক্ষে চাপিয়া বয়ান
তার সর্ব্ব অঙ্গ দিয়া আলিঙ্গিয়া মোরে
সুগভীর স্বপ্ন মাঝে করে সে প্রয়াণ !
কভু মোর দেহ বহে তার আঁখি লোরে
কভু বড় প্রীতি ভরে কুসুমিত কায়
স্তনশিথিলবন্ধ এ অঙ্গে এলায়।

সে বুঝি স্বপনে মোর পরাণের মাঝে
বিহরে দুরান্ত দূরে—যেথা জেগে আছে
আমার মাধুর্য্য, প্রেম—অনন্ত বিস্তার
গোধূলিগম্ভীর সেই মহাপারাবার !

তব প্রেমে প্রাণ পরিপূর্ণ হয় কূলে
অধীর আনন্দে আমি হেরি আপনারে
লয়ে যাও তুমি মোর সরবস্ব তুলে
ভাসিছে হৃদয় মোর তব প্রেমধারে !

—•—

দিবায়।

দিবায় বঙ্কিম গ্রীবা দূরে দাঁড়াইয়া
সে মোরে নিরখে চাহি এক দৃষ্টে স্থির ;—
অধরের কোণে কোণে ঈষৎ হাসিয়া
আমার সর্ব্বাঙ্গে হানে দৃষ্টি সুগভীর !
প্রেম তার বুঝি দিব্য সৌন্দর্য্যে মণ্ডিয়া
প্রতি অঙ্গ মোর—তাহা দেখে নেহারিয়া
অতুল হৃদয়ানন্দে—যথা নিশাপতি
আপন জ্যোছনাধারে সিঞ্চি বসুমতী
তার পানে চেয়ে থাকে মুগ্ধ দরশনে
সারারাত্রি, পক্ষপাতবিহীন নয়নে !
ওগো মোর সর্ব্ব অঙ্গ বুঝি পুষ্পময়
অমৃত সাগর হ'তে এনু স্নান করি !
অন্তর বাহির মোর তোমার প্রণয়
অশেষ মধুর রসে আছে পূর্ণ করি !

—•—

রাত্রে মিলন।

পাণ্ডুর সাগর দীর্ঘ কৃষ্ণ তীর তায়
পীত অর্দ্ধ চন্দ্রকলা পড়েছে নামিয়া,—
চমকিত বীচিমালা নেচে নেচে টুটে
ছোট ছোট অগ্নিচক্রে, নিদ্রা হ'তে উঠে—
তখন্ থামায় তরী ধাইয়া আসিয়া,
জলবাঁকে—হৃতবেগ সিক্ত সিকতায়।

সিন্ধুগন্ধি উষ্ণ বালুতীর তার পর—
ক্রমে তিনখানি মাঠ, প্রান্তে বাড়িখানি—
দুয়ারে একটু হানা দ্রুত বিদারণ
দেশলায়ে—দীপ্তি সনে নীলাভস্ফুরণ
পরে সুখশঙ্কাত্রস্ত মধুময় বাণী
দুটি লয় বক্ষোস্পন্দ হ'তে মৃদুতর!

—•—

প্রাতে বিদায়।

ত্বরা অন্তরীপ ঘেরি ছুলে জলভার
গিরিপ্রান্ত হ'তে রবি হেরিল জগৎ
পড়িল তাহার তরে স্বর্ণ রাজপথ
মোর তরে জনপূর্ণ জাগিল সংসার।

ব্রাউনিং

—•—

প্রেমের স্বপ্ন।

কেহ মোরে এত ভালবাসে ?
এ কি কথা শুনাইলে সখা ?
বেড়াইতে গিয়েছিনু বনানীর পাশে
সারাদিন ঘুরে ঘুরে ফিরেছিনু একা !

বসন্তের আরম্ভ দিবস
চ্যুতপাতা পড়িয়া তলায়
ছুটে-আসা বাতাসের সনে
ক্ষণে ক্ষণে ঘুরে উড়ে যায়।

তরুকাণ্ডে পত্রজীবনের
দেখা যায় আভাস নবীন,
নব জীবনের রস ল'য়ে
বাতাস বহিছে সারাদিন—

হোথা গিরগিটি এক ফিরে
শুষ্ক চ্যুত পাতার মাঝার,
পাখী করে তরুদল শিরে
আয়োজন বাসা বাঁধিবার !

বৃদ্ধ জীর্ণ তরু মুঞ্জরিবে—
নব তরু দিবে গন্ধ ফুল !

রসভর আত্র দুলাইবে
রসাল সে সহকারকুল।

ধরণীর সুন্দর পরাণ
আনন্দে হইবে উদ্ঘাটিত—
আমি সখা কোন প্রাণে তবে
লয়ে থাকি অন্ধকার চিত ?

সারাদিন তাই বনে ঘুরে
দুঃখজয় করিতে ছিলাম।
প্রেম নাই ? দুঃখ তাহে কিবা ?
—আপনারে ধিকার দিলাম।

নব জীবনের আয়োজনে
নব পল্লবের আলিঙ্গনে
গ্রীষ্মের মধুর আরম্ভনে
নবীন পাতার গন্ধ সনে

মিলে মিলে চিত আনন্দিত—
দুঃখভার সকলি বিস্মৃত !
সায়াহ্নে উদয় বেলায়
ফিরিলাম সত্য, হয়েছিত !

হেনকালে কি শুনালে সখা ?
মোর লাগি ওই বাতায়নে ?
কতদূর হ'তে সে এসেছে
আমাদেরি উদ্যান ভবনে ?

সুমধুর সন্ধ্যাতারা সম,
সুবিমল গ্রীষ্মশশী সম,
আজি মোর হৃদয় গগনে
আলো কি উদিবে অনুপম ?

শান্তচিত, কিছু চাহি নাই
ঘরে গিয়া গাহিতাম গান—
একা ছাদে নিশীথ অবধি
বাজাতেম সপ্তস্বরা খান ।

কি জানালে কি জানালে সখা ?
এতো নহে ভ্রম, প্রতারণা ?
সত্য, সখা আজিকার দিনে
অসম্ভব নহে এ ঘটনা !

এত সুখে কাটিয়াছে দিন
সারাদিন চিত্ত সুবিমল

ধরার নবীন প্রাণ সনে
প্রাণ মোর হয়েছে চঞ্চল !

সম্ভব আজি এ মনে হয়
সত্য, আজি সত্য মনে হয়
প্রেমমুখ অশ্রু মুছি' আসি'
ভরি দিবে এ শূন্য হৃদয় !

চল সখা চল সেথা যাই
সে কোন্ নিভৃততম ঘরে
বসে আছে ? দেখাইয়া পথ
চল আগে……এই কক্ষপরে ?

জোছনায় ভাসিছে দেয়াল
জানালায় তব ছায়া আসি
চৌদিকে জাগিয়া নানাছাঁদে
নাচয়ে এলায়ে কেশরাশি !

ছায়া আলো হাসি হাসিতেছে ?
আলোকে আলোকে হাসি তার !
ছায়ায় ছায়ায় আঁখিপাতা
লেশস্পর্শে করেছে প্রসার ?

একটু এ মৃদুল সৌরভ
হিয়ায় আসিয়া যেন পশে
কক্ষটিরে আজি এ সন্ধ্যায়
কে সিঞ্চিল স্বপনের রসে ?

কেহ নাই হেথা কেহ নাই
ছায়া আলো শুধু গন্ধ আর
সখা ওগো পেয়েছি পেয়েছি
পেয়েছি গো হৃদয় আমার !

হিয়া হ'তে অশ্রু কিছু গলে
সুমধুর সন্ধ্যা তারা সম !
বায়ুবহা দিবসের শেষ
লভিনু আলোক নিরুপম !

—•—

বসোরার গোলাপ।

বসোরার গোলাপ কাননে
কোমল লতিকাবেড়া
গূঢ় কুঞ্জবনে,
গাঢ় আলিঙ্গনে
কিশোর কিশোরী ছুটি, গোলাপের সেরা
(যৌবনের কাননের)
ফুটি' সঙ্গোপনে
এক বৃন্তে—বসোরার গোলাপ কাননে।

"পিয়ারি, এ চিকুর তোমার—
এই যে মাথার পরে
হেরি অন্ধকার ?
ঘন গন্ধভার—
এ যে মোর নিশোয়াস আনে রোধ করি—
মগন মগন হিয়া !"
"গোলাপলতার
সুজটিল চাঁদোয়া ও আমা দোঁহাকার !

"গোলাপের বিতান সকলি !
পিয়ারি, চুম্বনে মোর
গোলাপের কলি ?"

"রে প্রলাপী অলি,
এ কলিকা হীনরব চুম্বনেতে তোর
এখনি উঠিবে ফুটি"
লয়লীর ঠোঁট দুটি এ গোলাপ-কলি।"

বসোরার গোলাপ কাননে
জটিল লতিকাবেড়া
গূঢ় কুঞ্জবনে,
ফুটে সঙ্গোপনে
প্রতি রজনীতে দুটি গোলাপের সেরা
এক বৃন্তে, শতশত
গোলাপের সনে
প্রতিরাতে বসোরার গোলাপ কাননে!

—•—

ভগ্ননগরে প্রেমসম্মিলন।

যেথা মন্দস্মিতা সন্ধ্যা প্রান্তভূমে দাঁড়ায়ে মধুর
ব্যাপি' বহুদূর
নির্জ্জন কান্তার পরে,—গৃহমুখী যেথা মেষপাল
অলস নিদ্রাল
রুণু রুণু চলিয়াছে, মন্দালোকে, থামি কভু ছুটি
শষ্প খুঁটি খুঁটি

হোথায় নগরী ছিল হর্ম্ম্যময় বিপুল বৈভব
(শুনি জনরব)
এ দেশের রাজধানী, হোথায় রাজেন্দ্র নরপাল—
গেল বহুকাল
সমুজ্জ্বল সভা মেলি বসিতেন মন্ত্রি' বহুতর
সন্ধি ও সমর।

আজি সর্ব্বদেশময় তরুটিও অবশেষ নাহি,
ওই দেখ চাহি',
ঢালু শষ্প ভূমি যত পরস্পরে মিলায় মিলায়
এক হয়ে যায়,
শুধু হোথা শৈল হ'তে স্রোত, ধারা বহি মাঝে মাঝে
ভেদ রচিয়াছে।

প্রাসাদ হোথায় এক মহাকায় শুভ্রগম্ভীর
ছিল ঊর্দ্ধশির—
উচ্ছ্রিত রহিত যার শত শত চূড়া অনুপম
বহ্নিশিখা সম
শতদ্বারবিরাজিত দূরবেষ্টী প্রাচীরের পর
গঠন মর্ম্মর।
প্রাচীরে দ্বাদশ সাদী ছুটে যেত পাশাপাশি এসে
সহজে, অক্লেশে।

আজি হেথা হের এই শষ্পভূমে বসন্ত বৈভব
ধরণীদুর্ল্লভ।
যেন শ্যাম মখমলে পাতিয়াছে কোমল আস্তর
আর তারি পর—
নগরীর অবশেষ হেথা হোথা রয়েছে শয়ান
শুধু অনুমান!

হেথাই সে জনারণ্য বুঝি লক্ষ সুখে দুঃখে জাগে
বহুবর্ষ আগে।
কভু বা বিজয়ে প্রাণ মেতে যেত, কভু লজ্জাভয়
দমিত হৃদয়।
সে বিজয়, লোকলজ্জা—স্বর্ণ মূল্যে লভি এক মত
বেচাকেনা হ'ত!

আজি হেথা দেখিতেছ সঙ্গিহীন মঙ্ক ক্ষুদ্রকায়
প্রান্তর সীমায়—
ওই যে শিকড়ে ঢাকা, বনের লতায় অন্তরাল
কণ্টকে করাল,—
হেথা হোথা ভগ্নদেহে স্তীর্ণজাল লতিকার কলি
চাহে মুখ তুলি'—

ওই এক ভিত্তিশেষ—মহান্ জাগিত যায় পর
প্রাসাদ শিখর।
চক্রপথে অগ্নিরেখা জ্বলসাই স্বর্ণরথ যবে
ছুটিত গৌরবে—
হোথা হ'তে রাজা, প্রিয় পরিজন, সখীরা, রাণীরা,
হেরিতেন ক্রীড়া।

কিন্তু ওই আজি যবে মন্দরাগা সন্ধ্যা হেসে যায়
লইয়া বিদায়,—
গৃহে রাখি মেষপাল রুণু রুণু গলঘণ্টা রোলে
শান্ত সুপ্তিকোলে,—
যত উচ্চভূমি, যত স্রোতোরাজি গোধূলির ছায়
স'লে মিলে যায়—

জানি আমি হোথা এক আকুলাক্ষী রুক্ষকেশী বালা
প্রতীক্ষা-উতলা—

সেই মঞ্চ পরে যেথা রথিগণ, তন্বীগণে চাহি
ধাইত উৎসাহি—
রাজা হেরিতেন,—আজি চাহি আছে বালা, কথা নাই
যতক্ষণে যাই।

রাজা দেখিতেন চেয়ে নগরী, সে দূর চারিধার
দৈর্ঘ্য ও বিস্তার,
শৈলে শৈলে দেবগৃহ, স্থানে স্থানে অরণ্য বিদারি'
স্তম্ভ সারি সারি
কত সেই জলপথ, স্থলপথ, সেতুবন্ধ আর
জনতা প্রসার।

আমি যবে উতরিব, দাঁড়াইবে বালা বাক্য ভুলি,
দুটি হাত তুলি
মোর স্কন্ধ দুটি পরে, মুখ মোর প্রেমদৃষ্টি দিয়া
লবে আলিঙ্গিয়া—
সহসা মিশিব দোঁহে নিভাইয়া দরশে বচনে—
ঘন আলিঙ্গনে।

কবে তারা একদিন লক্ষ সৈন্য পাঠাল সংগ্রামে
দক্ষিণে ও বামে,
সমুচ্চ পিত্তল স্তম্ভে দেবমঞ্চ রচিল মহান্
গগন সমান,—

সে ঐশ্বর্য্য, সে প্রতাপ, কোথা তার জনম-সম্বল?
শুধু ধনবল।

হায় হায় রক্ত শুধে, জাগে মনে জলন্ত ধিক্কার
এইত সংসার!
এই শুধু, শতাব্দীর গণ্ডগোল পাপবিনিময়ে,
যাক্, যাক্ ব'য়ে—
রেখে দাও তাহাদের বিজয়ের গৌরবের ভার—
প্রেম সর্ব্বসার!

ব্রাউনিং।

—•—

কবির বিকল্প।

আমি তব বাগানের কুসতরু সখা।
রজনী শিশিরে সেঁচি বিমল করিবে তনু
ঝরিবে আমার শিরে ভ্রষ্ট তারকা।
গম্ভীর নিশীথ কালে অপ্সরী অমৃতকণা
ঢুলাবে কোরকে মোর ফিরিবে অলকা।
সারা রাতি সঞ্জীবন রস করি পান
প্রাণ ভরি সঞ্চি লব তব প্রেমগান।

খদ্যোতেরা সারারাতি জ্বালায়ে অধীর বাতি
ইন্দ্রের নয়ন সম রবে চারিধার!
আমার কুসুমকলি তাহাদের অনুকারে
নবীন উঠিবে ফুটি, বিন্দু সুষমার;—
পলাশের আশে পাশে ফুল ফোটা অনুভবি
গম্ভীর দাঁড়ায়ে রব আনন্দে অপার!
প্রভাতে তোমারি ভানু কিরণে ভরিয়া
তুলিবে পরাণ মোর আকুল করিয়া!

আনন্দে বাহিরি যাবে কবিতাকুসুম!
স্বরগের নিদ্রালস চক্ষে মোর লেগে রবে

ললাটে রহিবে মোর অপ্সরার চুম—
নরনারী ডালা লয়ে আসিবে তুলিতে ফুল
পড়ে যাবে হরষের কোলাহল ধূম!
পল্লবপরশ সম সম্ভাষি শীতল
তাহাদের চিত্তে দিব শান্তি নিরমল!

তোমার পবন মোরে লুটিবে হরষে।
তব জ্যোতি তব বায়ু তব দান পরমায়ু
ভোগ করি বেড়ে যাব বরষে বরষে!
সহসা দেখিব চাহি আমিরে অমরতরু
আর ত এ শাখা হ'তে পত্র নাহি খসে!
রজনীর আশীর্ব্বাদ, তারকার প্রীতি
মানবের প্রেম মোরে ঘিরে নিতি নিতি!

ধরা ঘুরে চন্দ্র ঘুরে দিবা রাত্তি আসে
গড়ায় গ্রহের দল গগন প্রাঙ্গণে
কভু ইন্দ্রধনু উঠে কভু ধূম্রকেতু ছুটে
সোহাগ করিছে রাহু রবি চন্দ্র সনে—
আমিরে অমর-তরু—কল্পতরু নাম
কুসুম ফুটিছে মোর শাখে অবিরাম!

ওই যে মানবদল বিহঙ্গ সমান
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে আর কররে প্রয়াণ।
মোর স্কন্ধে নিত্যগীত, শীতল পল্লব মাঝ-
শিরে মোর প্রসারিত আনন্দ অলকা!
আমি তারি বাগানের ক্ষয়হীন কল্পতরু
আমি তব বাগানের ফুলতরু সখা!

—•—

তাজমহল।

মর্ম্মর কবর নহে—নহে কভু নহে।
স্বরগের ফুলরাশি চিত্ত মোর কহে।
নন্দনবনের গাছে
যেই ফুল ফুটে আছে
তারি একরাশ সেথা স্তূপ হ'য়ে রহে।
মর্ম্মরের নিরমাণ নহে কভু নহে।

নীলনদী যমুনার বক্ষ উজলিয়া
নন্দনেরি পুষ্পরাশি পড়েছে ঝরিয়া।
ফুলেরি নিঃশ্বাস লভি'
নিভেছে সে জীব-রবি
কুসুমেরি ঘায়ে তাজ গিয়েছে মরিয়া!
নন্দনেরি ফুল সেথা পড়েছে ঝরিয়া।

শুভ্র তনু ঋষিবর চলেছিলা কবে—
ঝঙ্কারিয়া সুরবীণা পূরণিমা নভে।
শাজাহাঁর অঙ্কে লীন
মমতাজ সেই দিন
স্বপ্ন দেখেছিল এক প্রণয়-উৎসবে!
বীণাধ্বনি বেজেছিল পূরণিমা নভে।

যমুনাকল্লোল কাণে এসেছিল তার—
ভাবিল সে এ রজনী না পোহাক্ আর!
অমনি তাহাই হ'ল
বীণা হ'তে খ'সে প'ল
প্রেমসখী মরণের চিহ্ন ফুলহার!
পূর্ণিমা রাতি সেই না পোহাল আর।

তাই তার মৃতমুখে সুখের স্বপন
ফুটেছিল চন্দ্রকলাসম বিমোহন।
সহস্র বিলাপে তাই
হাস্যরুচি মুছে নাই
হাসি ঘিরে ঘুরিয়াছে আকুল কাঁদন—
তার মুখে ফুটে আছে সুখের স্বপন।

সে সুখ হাসির তুল্য নন্দনেরি ফুল,—
একরাশি ঢেলে গেছে সুরনারীকুল।
নাড়িয়া মন্দার শাখা
পারিজাতে দিয়ে ঝাঁকা,
যমুনার তটভূমি করেছে আকুল!
সে সুখ হাসির তুল্য স্বরগের ফুল।

পাতশাহ গিরি ভাঙি আনিয়া পাথর
রচেছে কি একখানি ধবল কবর?

আমি দেখি নাই তাহা,
দিবালোকে সবে যাহা
নেহারি প্রশংসাবাণী কহে বহুতর—
আমি দেখি নাই সেই মর্ম্মর কবর !

চৌদিকে উড়িছে ধূলি, দীপ্তভানু শিরে
লাঙল চালায় চাষী বালুবক্ষ চিরে
শুষ্ক নীর যমুনায়
তাহারি অদূরে আর
দীপহীন বিমলিন নরনারী ফিরে,
শকটশ্বসিত ধূম উঠে নভ ঘিরে—

আমি দেখি নাই সেই মর্ম্মর কবর !
জ্যোৎস্নাচন্দনের রসে রাত্রি জরজর—
তাজেরি হাসির মত
আধো চাঁদ অবনত
নিরখে পুলকিত শুভ্র স্ফুট ফুলধর
ভরপুর যমুনায় নীল কলেবর,—

সেই দেখিয়াছি আমি, কুসুমের স্তূপ
হাসিজ্যোৎস্নামাধুরীতে ধৌত অপরূপ !
শুনিয়াছি সুরবীণ,
চিত্তের মাঝারে লীন

আজো আছে চিরদিন রহিবে স্বরূপ
সেই দেখিয়াছি আমি কুসুমেরি স্তূপ।

মর্ম্মর কবর নহে—নহে কভু নহে—
কুসুমের রাশি সে যে চিত্ত মোর কহে।
নন্দনবনের গাছে
যেই ফুল ফুটে আছে
তারি সেথা একরাশ স্তূপ হয়ে রহে।

—•—

আগ্রাপ্রান্তরে।

ছিন্নপাখা মৈনাকের মত চারিধার
দুর্গ সারে সার
পড়ি আছে পরিশ্রান্ত, ধূলায় ধূসরকান্ত
তীরে যমুনার—
ছিন্নপাখা মৈনাকের মত সারে-সার।

গম্বুজে বুরুজে হর্ম্ম্যে কবরে কেল্লায়
ধ্বংসরাশি ভায়।
মর্ম্মরে পাথরে স্বর্ণে সফেদশোণিম বর্ণে
রাগিণী মিলায়—
সৌন্দর্য্যই শূন্যের মৃত্যুগীত গায়।

এই ধূলিবিপাণ্ডুর প্রান্তরের মাঝে
যেন বসি আছে
অন্ধ এক নিশাচরী কিবা দিবা বিভাবরী
বিনাশের কাজে
ধূলিবিপাণ্ডুর এই ধ্বংসরাশি মাঝে।

সে কভু জাগিবে নাক চিররাত্রি ধরি
হেথা রবে পড়ি'—
শত শত ইন্দ্রপুর সে শুধু করিবে চুর
মুষ্টি মাঝে ধরি'—
নিশ্বাসে উড়াবে ধূলি প্রান্তর উপরি!

তারি পদপ্রান্ততলে আমি প'ড়ে আছি,—
মনে লয় আজি
অতীত পাতালপুরে প্রভুস্বর বহুদূরে
কর্ণে উঠে বাজি ;—
সেইগানে কাঁদিয়া প'ড়ে আছি আজি।

রক্তমাখা শতদল হৃদয় আমার
ব্যথায় বিদার,—
ছিন্ননাল হেথা পড়ি ধূলে যায় গড়াগড়ি
উঠিবেনা আর !
এই ধূলিপুঞ্জ পরে সমাধি শয়ন
করেছে রচন !
আনো আনো সুনির্ম্মল নীল যমুনার জল
কর প্রক্ষালন,
বাঁচাও হৃদয়ে ঢালি বারি সঞ্জীবন !

হে জননী, সঞ্জীবনি, অমৃত পিয়াও !
ধূলা মুছে দাও
সমাধিশয়ন হ'তে তুলি মোরে ধরি হাতে
বনান্তে পাঠাও !
হে জননী, কবরের ধূলি মুছে দাও !

—•—

গদ্য।

বিদেশী বন্ধু

একটি বিশাল হ্রদ। ঐ তাহার উত্তরতীরে সুরেন্দ্রশরচ্ছিন্ন দৈত্যাজঙ্ঘার ন্যায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ শৈলশ্রেণী,—স্তূপাকার, বিশৃঙ্খল,—কোথাও তরুপুঞ্জে ধূসর, কোথাও নগ্নতায় বিকট, কোথাও হ্রদগর্ভে অবগাঢ়, কোথাও বা বিজনভীম ঊর্দ্ধে উচ্ছ্রিতশির। আপনাদের অবশ্য একটা কোন দেশ অনুমান হইতেছে—তা অনুমানই করুন, আমি কিন্তু এখন কিছু বলিব না। আর চাহিয়া দেখুন—পশ্চিমদিকে শৈলশ্রেণী যেন নামিয়া গিয়াছে।—ঐ একটি উপত্যকা। ওখানে মানুষের বসবাস আছে। ঐ দেখুন, উপত্যকা হইতে এখানে-সেখানে-ভগ্ন সোপানশ্রেণীর ন্যায় শিলাদেহ হ্রদে অবতরণ করিতেছে এবং তাহার ঊর্দ্ধভাগে একটি সঙ্গতাকার শিলাগঠন ধূধূ দেখা যাইতেছে। ঐ একটি বাড়ী। ঐ বাড়ীতে অনেকে সাধ করিয়া গিয়া বাস করিয়া থাকে। স্থিরবদ্ধ তরঙ্গরাজির ন্যায় পাহাড় যখন অধীরতাড়িত তরঙ্গ-ভঙ্গের সম্মুখীন হয় এবং আপন বক্ষে নিষ্পেষিত ব্যালোল ফেনরাজিকে মালতীমালার ন্যায় ধারণ করে—সেই নেত্রহর দৃশ্যটিমাত্রের দর্শনাকাঙ্ক্ষা ঐ-দেশীয় বহু যাত্রীকে ঐ অঞ্চলে আকর্ষণ করিয়া আনিত।

২

হ্রদের দক্ষিণতীরে একটি সহর। এখানে আমি বিদ্যার্থী হইয়া প্রবাসী। ঐ দেশের একজন অধ্যাপকের কাছে আমি পড়িতাম। 'এমার্সন' যে রূপান্তরনিয়মে 'অমরসূনু' হইতে পারে, সেই রূপান্তর-নিয়মে আমার অধ্যপককেও 'পিতৃসূনু' বলা যাইতে পারে। কিন্তু এ সংস্কৃতনামের বারবার আবৃত্তি ছাড়িয়া শুধু 'অধ্যাপক' নামেরই আশ্রয় লইব। আমার পণ্ডিতমহাশয়ের এরূপ একটি গৌরবাখ্যা ছিলও বটে।

আমাদের অধ্যাপকের একটি দুরন্ত পুত্র ছিল; অথবা সে-দেশীয় সকল যুবাই আমাদের কাছে অত্যধিক দুরন্ত বলিয়া বোধ হয়। অধ্যাপকের সম্পত্তির অধিকারী ঐ একমাত্র পুত্র। কিন্তু কখনও সে পড়াশুনায় মন দিত না। এই যুবার এইরূপ একটি নাকি বিশেষত্ব ছিল। এক-পাল কুকুর লইয়া সে নাকি আমাদের পূর্ব্বপ্রদর্শিত উপত্যকায় শীকার করিয়া বেড়াইত; আশেপাশে সমস্ত পর্ব্বতমালা তাহার কুকুরের চীৎকারে প্রতিধ্বনিত হইত। এই মাতৃহীন যুবক সঙ্কল্প করিয়াছিল, বিবাহ করিবে না। সেজন্য অধ্যাপকের কোনও ক্ষোভ ছিল না; কিন্তু তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের পুত্র ওরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকিবে, ইহাতেই তাঁহাকে কষ্ট দিত। বিদ্যালাভের উপর অধ্যাপকের একটি অসঙ্গত আস্থা ছিল—যাহা দার্শনিকেরই উপযুক্ত। এই দুটি পিতাপুত্রের সম্বন্ধ সেই দেশের সাধারণ পিতাপুত্রের সম্বন্ধ হইতে কিছু অন্যরূপ ছিল। এ সব কথা প্রথম অধ্যাপকের মুখেই জানিতে পাই।

অধ্যাপক মানুষটি বড়ই সরল প্রকৃতির—সহৃদয়তা এরূপ অল্পই

দেখিয়াছি। কিছুদিন তাঁহার কাছে পড়িতেই তিনি আমাকে তাঁহার গৃহে গিয়া বাস করিতে আহ্বান করিলেন। আমি ভয়ে ও আনন্দে অধ্যাপকের গৃহে স্থান লইলাম। কয়েকদিন যাইতেই অধ্যাপক আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"যুবক, আমার কথা শুন; আমার একটি দুরন্ত পুত্র কিছুদিন হইল ভ্রমণে গিয়াছিল; তাহার সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ সমাধা করিয়া আজই সন্ধ্যায় সে ফিরিতেছে। তোমার ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হইয়াছি, কিন্তু তাহার সহিত আরও বিবেচনা করিয়া চলিবে। অবশ্য তোমাদের বাসকক্ষ পরস্পরের নিকটে নহে এবং তুমি অধ্যয়নশীল,—অল্পই দেখা হইবে—তবু বলিয়া রাখিলাম। সে কাহারও সঙ্গে মিশিতে চাহে না। পড়াশুনার একরূপ বিরোধী। অত্যন্ত রাগী—হার্‌কিউলিসের মত গায়ে জোর! তবু"—(এইখানে ঠিক কথা ক'টি তুলিয়া দিই) "Yet the dog has a heart, he has a heart I am sure—an honest rascal.

সেইদিনই সন্ধ্যার সময়ে কে আমার কাছের সিঁড়িটি দিয়া গট্‌গট্‌ করিয়া উঠিয়া আসিতেছে। আমি যে দোতলাঘরে থাকিতাম, ঠিক তাহার উর্দ্ধে তেতলায় অধ্যাপক বাস করিতেন। তাঁহার কক্ষে যাইবার সিঁড়ি আমার কক্ষের দরজা মেলিতেই বারাণ্ডার বাঁ দিকে দেখা যাইত। আমি পদশব্দ শুনিয়াই, বারাণ্ডায় বাহির হইয়া অন্যমনস্ক-ভাবের ভাণ করিয়া একখানি পুস্তকহস্তে দাঁড়াইয়া রহিলাম। সর্ব্বাঙ্গ লম্বা কোর্ত্তায় ঢাকিয়া এক-পা এক-পা দৃঢ়ভাবে ধাপে ধাপে ফেলিয়া কে একজন উঠিতেছে। তাহার পশ্চাতে তিস্‌তিস্‌ তিস্‌তিস্‌ আরও কতকগুলি শব্দ শোনা গেল। এই-ই অধ্যাপকের পুত্রবর। সহসা

উপরে না গিয়া সে আমার দিকেই আসিল এবং পাঁচ সাতটা কুকুরে বারাণ্ডাটি যেন ভরিয়া গেল। রাঙারাঙা বিশৃঙ্খল চুল, জল্‌জল্‌ চক্ষু, অযত্নকর্ত্তিত গুম্ফশ্মশ্রু—একটা প্রকাণ্ড ধব্‌ধবে শাদা হাত সে আমার দিকে বাড়াইয়া দিল। আমি প্রস্তুত ছিলাম না—শেক্‌হ্যাণ্ড করিলাম। ইতিমধ্যে কুকুরেরা কেহ পশ্চাতের দু'পা ভাঙিয়া গম্ভীরভাবে প্রভুর দিকে চাহিয়া বসিয়া গেল, কেহ দাঁড়াইয়াই পুচ্ছ নাড়িতে লাগিল, আর কোনটা কোনটা আমার এবং সেই ভদ্রলোকের গায়ে উঠাউঠি করিতে আরম্ভ করিল। যুবা হাসিয়া বলিলেন, "আপনি সেই ভারতবর্ষীয় ছাত্র? এক্ষণি আসিতেছি, ক্ষমা করিবেন।"

আমি কিছু উত্তর না করিতে করিতেই কুকুরপালসঙ্গে যুবক উপরে উঠিয়া গেল। আমি একটু বিরক্তিমিশ্র বিস্ময় অনুভব করিতে লাগিলাম—ভারতবর্ষীয় ছাত্র বলিয়া যুবক হাসিল কেন? উপহাস? কিন্তু তাহার করমর্দ্দনের ভাবটি বড় সৌহার্দ্দ জানাইয়াছে ত। না, প্রতারিত হইলাম? ভাবিতে ভাবিতে কামরায় প্রবেশ করিয়া গিয়া বসিলাম। চাকর আলো দিয়া গেল। আজ তাহাকে "থ্যাঙ্ক্‌ য়ু" দিতে ভুলিয়া গেলাম—অন্যমনস্কভাবে বসিয়া থাকিলাম। যেন একটু কষ্ট হইতে লাগিল। কতদূর হইতে আসিয়াছি—কোথায় স্নেহ! কোথায় ভালবাসা! বাড়ীর কথা মনে পড়িল, বাঙ্গলার অনেক যুবকের মূর্ত্তি উঠিয়া মিলাইয়া গেল—অয়ানত চক্ষুপ্রান্তে অশ্রু বিগলিত হইল বুঝি! ইতিমধ্যে সেই বিশৃঙ্খল মূর্ত্তি, একগাল হাসিয়া আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে হাস্যে কোন সন্দেহ আর থাকে না। যুবা জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"আপনি কি এখনি আবার আপনার ঐ গ্রন্থে ডুব দিবেন? (আমার টেবিলে তখন একটিমাত্র প্রকাণ্ডকায় এমার্সনের গ্রন্থাবলী ছিল—সেইটি দেখাইয়া) ডুব দিলে শীঘ্রই আপনাকে ভাসিয়া উঠিতে হইবে। ইণ্ডিয়ান হইলেও আপনার আপেক্ষিক গুরুত্ব ঐ গ্রন্থ-জিনিষটির তুলনায় কম হইবে।" আমার অধ্যাপক আমার আগমন-বার্ত্তা সবিস্তারে তাঁহার পুত্রকে লিখিয়াছিলেন, তথাপি প্রথম সাক্ষাতেই এত উপহাস কেন? যা হউক, সহজেই আত্মসংবরণ করিলাম, বিশেষত তাহার মুখভাবটি আমাকে বড়ই আকৃষ্ট করিতেছিল। আমি বলিলাম :—

"আমি সম্প্রতি এমন কোন ডুবের চেষ্টা দেখিব না, তবে আপনার সঙ্গে একটা আলাপের মধ্যে ডুব দিবার ইচ্ছা আছে—যদি আপনার রুচিকর হয়।" কথাটা বড় সসঙ্কোচে বলিলাম।

"তবে আসুন না, আমাদের ডিনার আজ একত্র করিয়া লওয়া যাক। টেবিলে একঘণ্টা বেশ আলাপ চলিবে—তার পরেও আমার আপত্তি নাই,—সমস্তরাত্রি চলিলেও আমি পৃষ্ঠভঙ্গ দিব না—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ"—একটা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। আমি ভাবিলাম—বাঃ, এই কি মেশামেশি না করিবার মত লোক? না, আমিই বিদেশী চরিত্রে প্রতারিত হইতেছি? বলিলাম, "চলুন, সাহ্লাদে যাইতেছি।" পাশেই আমাদের ভোজনাগার। অধ্যাপকও আসিয়া ডিনারে যোগ দিলেন।

৩

পূর্ব্বরাত্রের ডিনারে আমাদের বন্ধুত্ব কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে।

রবার্টের সরলতা দেখিয়া তাহার পিতাও একরূপ বিস্ময়মিশ্র আনন্দ লাভ করিলেন। আমি বিশেষ আনন্দিত হইলাম।

পরদিন সকালবেলায় আমি অধ্যাপকের সঙ্গে পড়াশুনা করিতেছিলাম। গ্রীক্ দর্শন ও ভারতীয় দর্শন এই দুয়ের তুলনা ও আলোচনা চলিতেছিল। এইরূপ আলোচনার সময়ে বুড়া অধ্যাপকের ভাব দেখিলে আপনারা আশ্চর্য্য হইতেন—এবং তাঁহার চরিত্রটি বুঝিয়া লইতে পারিতেন। বুড়া আলোচ্য বিষয়টির মধ্যে এতদুর মগ্ন হইয়া যাইতেন যে, আর কিছুই তাঁহার বোধ থাকিত না। সেদিন ক্ষণে ক্ষণে তিনি চট্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেছিলেন এবং জোরে পকেটের মধ্যে হাত প্রবেশ করাইয়া দিতেছিলেন—মধ্যে মধ্যে যখন "O flight of human thought" কথাটি প্রতি পদাংশের উপর জোর দিয়া একরূপ উচ্চ ও কর্কশস্বরে উচ্চারণ করিতেছিলেন, তখন শরীরটিকে আরও ঊর্দ্ধ করিবার জন্য জুতার অগ্রভাগটুকুর উপরমাত্র ভর করিয়া দাঁড়াইতেছিলেন। সেই বিরলকেশ, পক্কশ্মশ্রু, হাস্যে ডগমগ মুখটি, সেই দীর্ঘ কৃষ্ণচ্ছদ, এবং সেই কালো পোষাকের উপর সাম্নে-ঝুলান দুখানা বড় বড় হাতের অঙ্গুলিবদ্ধ, জোর-করিয়া-যতদুর-সম্ভব প্রসারিত অবস্থা, কখনো হাতদুটির পশ্চাতে অঙ্গুলিবদ্ধ অবস্থা আমার আজও অবিকল মনে পড়িতেছে। সেইদিন প্রভাতেই গ্রীক্-দর্শনপ্রসঙ্গে সক্রেতিসের ব্যক্তিগত জীবনের কথা উঠিল। প্লেটোর Symposium বা 'ভোজ' নামক গ্রন্থে আপনারা মাতাল আল্‌কিবায়েডিসের মুখে উচ্ছ্বসিত আবেগে সক্রেতিসের চরিত্রবর্ণন পাঠ করিয়াছেন বোধ হয়। অধ্যাপক সেই বর্ণনা অবলম্বন করিয়া

Symposium-এর সেই ভাগটি একরূপ অভিনয় করিয়া দেখাইতে-ছিলেন। 'Then rushed in Alcibiades' এই বলিয়া তিনি দৌড় দিয়া কামরার এক ধার হইতে আর এক ধারে ছুটিলেন; টেবিলের উপর কনুই ভর করিয়া (যেমন অ্যাল্‌কিবায়েডিস্‌ করিয়া-ছিল) গল্‌গল্‌ গলগল্‌ করিয়া, কখনো গ্রীকে, কখনো ইংরেজিতে, বলিয়া যাইতে লাগিলেন।

"Then he took off his shoes and walked upon the snows" এই বলিয়া ঠিক আপনার জুতা-জোড়াটি খুলিয়া একধারে গিয়া আড়ষ্টমূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তাঁহার এই দৌড়া-দৌড়িতে কাচের কয়েকটা টিউব পড়িয়া গেল—সেদিকে তাঁহার লক্ষ্য নাই—আমার লক্ষ্য থাকিলেও, অভিনয়ে এতদূর আকৃষ্ট হইতেছিলাম যে, সেদিকে যাইতে পারিলাম না। আমাকে যেন যাদু করিয়া বসাইয়া রাখিত, হাত-পাটি নাড়িবার পর্য্যন্ত সাধ্য থাকিত না।

এইরূপ যাদুমন্ত্রে অধ্যাপক আমাকে শিখাইতেন, তাঁহার কথা বলিতে আরম্ভ করিলে আমার আর থামিবার জো থাকে না। যাক্‌, সেদিন পড়া সাঙ্গ করিয়া আমার কামরায় গিয়া দেখি, দরজার দিকে প্রকাণ্ড পিঠ দিয়া কে একজন বসিয়া আছে। একটা প্রকাণ্ড মাথা, একমাথা চুল!

পদশব্দে রবার্ট ফিরিয়া চাহিল।

"তোমরা অভিনয় করিতেছিলে?" রবার্ট কখন্‌ যেন উপরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

আমি। হাঁ, অধ্যয়নের প্রকৃষ্ট উপায় অভিনয়।

রবার্ট। (হাসিয়া) আমিও গ্রীকে বক্তৃতা করিতে পারি।

আমি। বেশ ত।

রবার্ট। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ বিশ্বাস করিলে? তুমি বড় সহজেই বিশ্বাস কর দেখিতেছি। এখানকার যুবাদের দলে মিশিয়াছ?

আমি। বড় বেশী নহে। কাল শুধু তোমার দলে।

রবার্ট। আমি এখানকার নহি।

আমি। তবে কোথাকার?

রবার্ট। Across the lake of the valley. হ্রদের পরপারে—ঐ উপত্যকার।

আমি। শীকারে বৎসরের কতমাস কাটাও?

রবার্ট। সারা বৎসর।

এই বলিয়া রবার্ট গম্ভীর হইয়া বসিল। "আমি আজই উপত্যকায় যাইব, আমাকে স্মরণ রাখিও।"

আমি। তুমি কি দীর্ঘ বিদায় লইতেছ?

রবার্ট। না, আমাকে তোমার প্রাণের কাছে রাখিও।

এই বলিয়া দুটা বড় বড় হাত বাড়াইয়া দিল। আমি প্রীতিপূর্ণ বিস্ময়ে বইগুলি ম্যাটিংএ ধপ্ করিয়া ফেলিয়া, হাতদুটি একত্র করিয়া আমার দুটি হাতে চাপিয়া ধরিলাম। রবার্ট আমাকে টানিয়া পার্শ্বের চেয়ারে বসাইল এবং আমার একটি বাহু তাহার বুকের উপর লইল। আমার চক্ষু প্রীতিতে বিস্ফারিত হইল। একি? এ দেশে আসিয়াও কি আমার এমন যুবা মিলিল? অনেকক্ষণ আলাপ চলিল। আমি আলাপান্তে বিস্ময়ে-প্রীতিতে পরিপূর্ণ হইয়া রহিলাম—সেদিন আর

পড়া হইল না। তিনচারিদিন ধরিয়া শীকারের আয়োজন চলিল। এই তিনদিনে আমাদের বন্ধুত্ব দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে লাগিল। চতুর্থ দিনে রবার্ট যখন চলিয়া গেল, মনে হইল, যেন আবাল্যের একটি প্রিয়সঙ্গ হারাইয়াছি—অথচ নূতন বন্ধুত্বের মাধুর্য্যই যে হৃদয়কে সুখ এবং পীড়া দিতে থাকিল, তাহা কিন্তু বুঝিতে পারিলাম।

রবার্টের সঙ্গে আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছে। তাহার হৃদয় কি মিষ্ট, কি উদার, কি উন্নত, কি সরল!

"সরলয়োঃ সখি সখ্যমনাবিলম্।" বিদেশ, বিজাতীয় ভাবা, কই কিছুতেই ত প্রাণের পথরোধ করিতে পারিল না! কিছুতেই ত আমাদের যৌবনসুন্দর হৃদয়ের মুখে দাঁড়াইতে পারিল না।

আমার পড়াশুনা, অধ্যাপকের সঙ্গে বিজ্ঞানচর্চ্চা—সর্ব্বত্রই রবার্টের কথা আনিতাম। অধ্যাপক একদিন হাসিয়া বলিলেন, দুটা বিপরীত প্রকৃতির গাছ যেমন কলমে জোড়া লাগে তোমরা সেইরূপ মিলিয়াছ। আমি এতদূর আশা করি নাই, কিন্তু (হাসিতে হাসিতে) জান ত, He is an honest rascal, an honest rascal—more honest than I understand! আমি উৎসাহসহকারে বলিতাম, "এ দেশে উহার মত দ্বিতীয় যুবক আর নাই।" অধ্যাপক হাসিয়া বলিতেন "That's youth, that's youth—Ah Golden." এই বলিয়াই অঙ্কক্ষা বা পড়া আরম্ভ করিতেন। এই একটি কৌতুক! আমি বুড়াকে কখনো এইরূপ Golden এর মত বিশেষ্যহীন বিশেষণগুলিকে পূর্ণ করিতে শুনি নাই। বিশেষণ বিশেষ্যের অপেক্ষা না করিয়াই হাঁটু ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যাইত। যাক্ সে কথা।

একদিন রবার্ট আর একবার শীকার সাঙ্গ করিয়া ফিরিয়াছে। সারাদিন মৈত্রীর উৎসবে, নানা আলাপে কাটিয়া গেল। আজি যেন রবার্ট মাঝে মাঝে একটু উতলার ভাব ধারণ করিতেছিল—তাহার দৃষ্টি ক্ষণে ক্ষণে অনির্দ্দিষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। এ কথা আমার কাছে বরং শেষে, স্মৃতিতে উপস্থিত হইয়াছিল এবং এখন মনে পড়িতেছে; তখন তত লক্ষ্য করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। রাত্রে রবার্ট আমাকে ডাকিয়া লইয়া চৌতল কক্ষে বসিল। ডিনারের পর তখন আটটা রাত্রি হইবে। কার্পেটে ম্যাটিংএ আলো পড়িয়াছে। কেদারাগুলি যেন বুড়ামানুষের মত বসিয়া-বসিয়াই ঘুম দিতেছে। রবার্টের মায়ের একটি বৃহৎ ছবি ঠিক আমাদের মাথার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া যেন আমাদের মৈত্রীসুন্দর আলাপ শুনিতেছে এবং প্রীতির হাস্য হাসিতেছে। ঐ সুন্দর স্নেহময় মুখখানি মনে মনে কত পূজা করিয়াছি। রবার্টের দুটি বেহালা বক্ষের বক্রখাতে অন্ধকার জমাইয়া যেন এক এক জোড়া বিকটমন্ডিত শুন্ড প্রদর্শন করিয়া, আমাদের নিকটেই দেয়ালে দুলিতেছে। সেই নীলাভামিশ্র আলোকে সকল নির্জীব বস্তুকেই সজীবের মত বোধ হইতেছিল। আমরা দেয়ালের কাছে আসিয়া বসিয়াছি। এই রবার্টের শয়নগৃহ। ঘরটি বেশ বড়। আস্‌বাব্ স্বল্প।

রবার্ট কেদারার এক ডানার উপর শরীরার্দ্ধ হেলাইয়া, পিঠ ঠেকাইয়া বসিল এবং দুটি হাতে আমার গলদেশ আকর্ষণ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "তুমি কি বোধ কর আমাকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিয়াছ? আমার হৃদয়ের সব কথা জানিয়াছ?"

আমি। সব কথা কে জানে? তবে বহুদূর জানিয়াছি।

রবার্ট। Fool!

এই বলিয়া একটু মৃদু হাসিল, আবার গম্ভীর হইয়া বলিতে আরম্ভ করিল—

"আচ্ছা মনে কর মিনার্ভার একটি শ্বেতপ্রস্তরমূর্ত্তি আছে।"

রবার্ট আজ থামিয়া থামিয়া কথা বলিতেছিল, অন্যান্য দিনের ন্যায় গল্‌গল্ বেগে নহে। আমি বলিলাম, "বেশ, তার পর?"

রবার্ট। মনে কর পরমাসুন্দরী।

আমি। বেশ।

রবার্ট। তুমি তাহাকে ভালবাসিয়া জীবন কাটাইতে পার না?

এই বলিয়া রবার্ট ঘুরিয়া-বসিয়া আমার বাহু তাহার বাহুতে জড়াইয়া লইল এবং অঙ্গুলিগুলি আমার অঙ্গুলিগুলিতে বদ্ধ করিয়া করতল একটু জোরে পিষ্ট করিল—আবার বলিল, "একটি পরমাসুন্দরী মূর্ত্তিকে হৃদয় দিয়া জীবন কাটাইতে পার না?"

একি অদ্ভুত প্রশ্ন? আমি বিস্মিতস্বরে তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলাম, "প্রস্তরমূর্ত্তি? না।"

রবার্ট। মনে কর, সে যদি চলিতে পারে; তার অঙ্গ যদি গোলাপের ন্যায় কোমল হয়; তার কেশ যদি পবনের ক্ষমতার বাহিরে না থাকে; তার চক্ষুর গোলাপী পাতা যদি ওঠে-নামে; তার নাসিকা হইতে যদি হৃদয়ের উত্থানপতনের অনুগামী লঘুনিশ্বাস বাহির হয়; (আমার দৃষ্টি এতক্ষণ কেবলি বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া তাহার অনির্দ্দিষ্ট দৃষ্টির উপর স্থাপিত হইতেছিল) তার চক্ষুর দৃষ্টি

যদি কোমল, মধুর, উজ্জ্বল, হাস্যে দীপ্ত, করুণায় সজল হয়—হর্ষচঞ্চলতা অপেক্ষা বরং করুণ গাম্ভীর্য্যই ব্যঞ্জিত করে ; তার ওষ্ঠাধরের গোলাপ যদি ভয়ের শীতবাতে কম্পিত এবং সুখের আকুলস্পর্শে হাস্যে প্রস্ফুট হইয়া উঠে ; তার বাহু যদি রোমীয় দীর্ঘচ্ছদ পরিহার করিয়া আধুনিক ল্যাভেণ্ডার-বস্ত্রে আবৃত হয়”—

বাধা দিয়া আমি আমার বিস্ময় গোপন করিয়া, উপহাসস্বরে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম—

“তুমি দেখি আর ভুমণ্ডের পূর্ব্বে থামিতেছ না—থাম থাম—সংক্ষেপে বল না কেন—সে যদি পরমাসুন্দরী একটি আধুনিক কন্যা হয় !—হাঁ, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাকে ভালবাসিয়া জীবন কাটাইতে পারি”—বলিয়াই আমার বোধ হইল যেন উপহাস বড় রূঢ় হইয়াছে। রবার্টের দৃষ্টি তখনও অনির্দ্দিষ্ট। সেই অনির্দ্দিষ্ট তরলসুন্দর দৃষ্টিটি ঘুরিয়া আসিয়া আমার চক্ষুর উপর স্থাপিত হইল। সেই দুর্ভ্জের-গভীর দৃষ্টি দেখিয়া আমার মূঢ়তা আমি বিশেষরূপে অনুভব করিতে লাগিলাম, আমার কষ্টবোধ হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে আমার কল্পনাতে একটি প্রেমকাহিনী জাগ্রত হইয়া উঠিল—রবার্টের হৃদয়ের একভাগ যেন একটি কোন্ স্বপ্নময়—সৌন্দর্য্যময় কক্ষে অবতরণ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল—তাহার তরল দৃষ্টি রহস্যে অতিমাত্র নিগূঢ়ভাব ধারণ করিল। উৎফুল্ল হইয়া অর্দ্ধস্পষ্টস্বরে বলিয়া উঠিলাম, “কত সুন্দর ! কত সুন্দর !” রবার্টেরও যেন একটা চিন্তা অপগত হইল। নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে সে বলিতে লাগিল—

“যাক্ যাক্ ! তুমি এখানকার যুবকদল ভাল করিয়া জান ?

এমন খারাপ জীব আর কোথাও পাইবে না। তাহাদের মুখের উপর থুথু ফেলিতেও আমার ঘৃণাবোধ হয়”—(ক্রমেই স্বর চড়িতেছিল) “তাহাদের ভালবাসা সব খেলা, কুপ্রবৃত্তি, উচ্ছৃঙ্খলতা”—(হঠাৎ বাহু ছাড়াইয়া লইয়া দুই করতলে এক সশব্দ আঘাত করিয়া) “এই-জন্যই ইহাদিগকে আমি কুক্কুরের ন্যায় দেখি—কথাও বলি না” (সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে, আমিও সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলাম)—“বালিকাগুলিই কি ভাল? সেগুলিকেও খারাপ করিয়া তুলিয়াছে! সহরে কখনো, কখনো থাকিও না—ঐ উপত্যকার গ্রামে গিয়া গৃহস্থাপন কর। কথা! কেবলি কথা! কথা বন্ধ করিয়া দাও,—হাজার-এক বিপদ অন্তর্ধান করিবে। কথা না থাকিলে হৃদয়ের অনুভবশক্তি প্রখর হয়, সর্বাঙ্গে হৃদয় ফুটে!”—আবার আসিয়া বসিল। কিন্তু একি? এ কোন্ রহস্য? আমি রবার্টের বাহুর উপর করতল ন্যস্ত করিয়া কহিলাম, “একি? রবার্ট, একি?”

রবার্ট এবার—যেন উত্তেজনা অপগত হইল—আমার দিকে ফিরিয়া, কিছুক্ষণ পরে হাসিয়া বলিল, “The sweetest story.”

আমি। খুলিয়া বলিতে আপত্তি আছে কি?

রবার্ট। আপত্তি! দূর!

এই বলিয়া আমার স্কন্ধে বাহু তুলিয়া দিল এবং বলিতে আরম্ভ করিল। ধীরে ধীরে রবার্ট তাহার sweetest story প্রকাশিত করিল। ধীরে ধীরে তাহার মনের দ্বার খুলিয়া একটি বিচিত্র, মনোহর হৃদয়-পক্ষী আমার দৃষ্টিপথে উৎপতিত হইল। আমি রবার্টের পুণ্যস্পর্শ অনুভব করিতেছি বলিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলাম।

ঘরে গিয়াও সারারাত সেই অদৃষ্ট উপত্যকার কথা, তাহার মধ্যে একটি বিদেশী-ভাবের গ্রামের কথা, নূতন-রকম গৃহপ্রাঙ্গণ গৃহ-শ্রীর কথা, একটি প্রস্তরহর্ম্ম্যের মধ্যস্থিত একটি সৌম্যা সুন্দরীর কথা ভাবিতে থাকিলাম। ভাবিতে থাকিলাম, ঐ উপত্যকায় যেমন একটি অজ্ঞাত গ্রাম আছে ; তাহার উদ্যানে উদ্যানে কিরূপ ফলের গাছ, ফুলের গাছ, শুধু ছায়ার গাছ ; রাঙা-রাঙা কুর্ত্তি পরিয়া বালিকারা সকালবেলায় তরুচ্ছায়ায় দুগ্ধ দোহন করিতে থাকে, কেমন গুনগুন করিয়া তাহাদের মনিবগৃহের সুন্দরী কন্যার গুণের কথা জল্পনা করে—আমার এই প্রবলহৃদয় বন্ধুটি কিরূপে তাহার হৃদয়টি ঐ বালিকার প্রেমস্পর্শে অবনমিত করিয়াছে। কেমন সে একদিন শীকারে গিয়াছিল—যাত্রার সেই মাহেন্দ্রমুহূর্ত্তে অদৃশ্য পরীগণ কি তাহার কণ্ঠে বরমাল্য নিক্ষেপ করিয়াছিল? অশ্বের সুন্দর গ্রীবাটি বাঁকাইয়া টানিয়া সেদিন কি রবার্ট ঐ দ্রঢ়িষ্ঠ পশুর নেত্রে এক অপূর্ব্ব প্রসন্নতা দেখিতে পাইয়াছিল? কেমন করিয়া আমার বন্ধুর রুধিররঞ্জিত শীকারলব্ধ হরিণীটিকে গ্রামের পথ দিয়া বন্ধুর সেই শিবিরে লইয়া যাইতেছিল—তখন কেমন একটি পুরাতন গাড়িতে একটি সুন্দরী ধনিকন্যা বায়ুসেবন করিতেছিল—হঠাৎ সেদিন রক্তাপ্লুত মৃগীর দৃশ্য দেখিয়া তাহার প্রাণে কিরূপ আঘাত লাগিল,—কেমন করিয়া কি মধুর ভাষায় করুণা প্রকাশ করিল! বিদেশিনীর মস্তকে টুপি! কিরূপ বেশভূষা! গৌরকপোল কিরূপে করুণচক্ষের পল্লবচ্ছায়ায় ছায়াভারাক্রান্তের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। রবার্ট মোহিত হইয়া গেল। ঘোড়া হইতে নামিয়া শীকার কিশোরীর চরণে রাখিয়া আর প্রাণিহিংসা না করিতে

মনে মনে সঙ্কল্প করিল। কিশোরী কিরূপ মৃদুমৃদু হাসিয়া তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার মুখপানে তাকাইল! সে এই সহরাগত ভদ্রলোকটির সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া রবার্টকে তাহাদের ভবনে আহ্বান করিল! রবার্ট পটগৃহ ভাঙিয়া সেই উপত্যকার ভবনে আশ্রয় লইল! রবার্টের নূতন জীবন আরম্ভ হইল। এই এমিলিই বা কিরূপ?—কে জানে কিরূপ! মুহুর্মুহু হাস্য করে, অথচ কথা বলে না—এ কিরূপ! তিনদিন যায়, চার দিন যায়, তাহার ভ্রাতা সমস্ত আদর-অভ্যর্থনা করে—অথচ এমিলির কেন কথা নাই? রবার্ট কাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও ভয় পাইতেছে, কেবল একটি গভীর রহস্যের অপেক্ষা করিয়া প্রতিদিন হৃদয়ে গুরু-ভার অনুভব করিতেছে। এমিলি নীরব! এই নীরবতাহেতুই তাহার প্রতি-অঙ্গের যেন একটি ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা আছে। তাহার দৃষ্টিতে যেন সুর উঠে—কখনো গভীর-করুণ, কখনো বা হাহাত্রস্ত! তাহার গ্রীবার ভঙ্গীতে, মস্তকের হেলনেই অনুনয়, অনুমোদন, অঙ্গীকার সুব্যক্ত হয়—কথায় যেন এরূপ হইত না। হৃদয় হইতে একটি ভাব কথায় রচিত হইয়া আসিতে আসিতে যেন অর্দ্ধেক কৃত্রিম হইয়া যায়, কিন্তু ভঙ্গীতে যেন অতি সহজে দুলিয়া উঠে। এমিলি যেন নীরবতার মধ্যে ডুব দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রবার্ট কখনো বা দেখিল, ছায়ান্ধ-কার বাতায়নে এমিলি দাঁড়াইয়া আছে—বাড়ীর চারিটিধার ছায়াসুপ্ত, নীরব পুরাতনত্বের অঙ্গুলিচিহ্নিত—নীরব প্রস্তরমূর্ত্তিটি যেমন নীরবতার অতল সমুদ্রের মধ্যে ডুব দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে—যেখান হইতে কখনও আর তাহাকে তোলা যাইবে না—দেখিতে দেখিতে দেখা যায়, যেন তাহার অঙ্গুলির চিরস্থির ভঙ্গীটি হইতে তাহার কেশরেখাটি অবধি,

তাহার মসৃণোজ্জ্বল দেহভাতি অবধি, কোন-না-কোন গভীর ভাব ব্যক্ত আছে—এমিলিও বুঝি সেইরূপ। সেই নীরবের উপর আবার চলিত লতাটির ন্যায় গতিচাঞ্চল্য। উড়ু উড়ু চুল, চক্ষুর গোলাপী পাতার ওঠা-নামা, চক্ষুতারকার সুগভীর প্রকাশ, ওষ্ঠাধরের হাসি, শরীরের মৃদুলতা, বাহুর আন্দোলন! এ কি বিচিত্র রূপ! রবার্ট এইজন্যই বুঝি আজ মিনার্ভার মূর্ত্তির কথা আনিতেছিল। * *

তারপর? তার পর রবার্ট কেমন করিয়া পঞ্চদশদিনে এই পিতৃমাতৃ-হীনা বালিকাকে বিজন কক্ষতলে রাত্রিতে আত্মসমর্পণ করিল! রহস্যের বাঁধ আর হৃদয়কে ফিরাইতে পারিল না। এমিলি কিরূপ কিছুক্ষণ তাহার থরথরকম্পিত বক্ষের উপর রবার্টের হস্তটি চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়া সহসা ছাড়িয়া দিয়া ছুটিয়া গেল—একখণ্ড কাগজে কি লিখিয়া আনিয়া, রবার্টের সম্মুখে টেবিলে রাখিয়া, হাঁটু ভাঙিয়া পড়িল—তাহার উরু জড়াইয়া ধরিয়া অধীরভাবে চুম্বন করিতে লাগিল! রবার্ট ত্রস্তব্যস্ত হইয়া তাহাকে উঠাইতে গেলে, সে কেবল অশ্রুপূর্ণদৃষ্টিতে কাগজটি দেখাইয়া দিল—রবার্ট কাগজ দেখিতে অগ্রসর হইলে, এমিলি কেমন করিয়া ছুটিয়া গিয়া এক কোণে দুই হাত আড়ষ্টভাবে পার্শ্বে লম্বিত করিয়া দাঁড়াইল! তখন তাহার চক্ষু কিরূপ দীপ্ত, তাহার বদনমণ্ডলের প্রতি-রেখা কিরূপ উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল—শ্বাস কিরূপ ঘনঘন বহিতেছিল! রবার্ট পড়িয়া দেখিল, কাগজখানিতে লেখা রহিয়াছে—"I am dumb!" "আমি বোবা!" বোবা? এমিলি যেন নিস্তব্ধতার অতল সমুদ্রে ডুবিয়া গেল! তাহার প্রতিঅঙ্গে যেন অগাধজলভেদী রশ্মি একটি নিগূঢ়

রহস্ত সমর্পণ করিল! যতক্ষণ রবার্ট চাহিয়া দেখিতেছিল, ততক্ষণ এমিলির হৃদয় কিরূপ নির্দ্দয় বেগে কাঁপিতেছিল, তাহার মস্তকের কেশরাজি বুঝি কণ্টকের মত দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল! কিন্তু স্বর্গ আর প্রেম এক! রবার্ট স্বর্গীয়! রবার্ট বলিয়া উঠিল, "Speech is trifling! that of the tongue—রসনার কথা অকিঞ্চিৎকর!" সহসা দুইজনেই ছুটিল, অকম্পণে আলিঙ্গনে বদ্ধ হইল!—এমিলির হৃদয় কি বেগে আবার কাঁপিয়া উঠিল—ঝর্‌ঝর্ ঝর্‌ঝর্ অশ্রু নামিয়া গেল! রবার্ট স্বর্গীয় আনন্দে মুগ্ধ হইয়া রহিল। উভয়ে সন্নিহিত কোচে গিয়া বসিল! আলিঙ্গনে, নিঃশব্দতায় হৃদয়ের উপর হৃদয় কাঁপিতে থাকিল, বাহুতে বাহু জড়িত হইল, ওষ্ঠ ওষ্ঠে বদ্ধ হইল,— অবশেষে বুঝি নিদ্রা দুজনাকে আপনার স্বপ্নমন্দিরে টানিয়া লইয়া আরও গভীরভাবে দুজনার পরিচয় করাইয়া দিল। কোন প্রথম প্রণয়িযুগলের অজস্র জল্পনায় এরূপ প্রথম পরিচয়,—হৃদয়ে-হৃদয়ে নিগূঢ় আত্মসমর্পণে এরূপ প্রথম পরিচয় আর কোথাও হইয়াছে কি?

আমি সমস্ত রাত্রি বিস্ময়ে, আনন্দে রবার্টের স্বর্গীয় চরিত্রের ধ্যানে যেন আর ঘুমাইতে পারিলাম না। কেবলি ভাবিতে লাগিলাম, তাহার জীবনের মূল কোথায়? এই বিশৃঙ্খলমূর্ত্তি, অসামাজিক, বিদ্যাবিমুখ যুবকটিকে কেহই প্রকৃতরূপে জানে না। পিতা ভাবেন, 'an honest rascal'; যুবকেরা ভাবে, 'idiotic'; চাকরবাকর সবাই ভাবে, একজন অশান্ত শীকারী! কিন্তু এই বাগবিমুখ যুবকের হৃদয়টি কোথায় বিশাল হ্রদের পরপারে, উপত্যকার গ্রামটিতে একটি কেমন সুন্দরী সকরুণা কিশোরীর হৃদয়টি অবলম্বন করিয়া

তাহার চারিদিকে ললাটবেষ্টনী মালার ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া আছে! এই যুবক বিবাহ করিবে না—হায়! সে কথার রহস্য কে জানে! এই যুবক শীকার করিয়া ফিরে—হায় সে কথার মর্ম্ম কে বুঝে! আমি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলাম যে, এমন বন্ধু আমার মিলিয়াছে—এমন রহস্য আমার কাছেই শুধু প্রকাশিত হইয়াছে। আমার চিত্ত সেই বিশাল হ্রদটি পার হইয়া বরাবর সে উপত্যকায় অজ্ঞাতগ্রামে উদ্ভ্রান্ত হইল—কখনো বা ভাবিলাম, আমার গ্রামের কল্পনা হয় তো সে গ্রামটির সহিত একেবারেই মিলিবে না।—আবার বাঙ্গলার কথা মনে হইতে লাগিল। কিন্তু ফিরিয়া ফিরিয়া এই বিদেশী সুহৃদের মাহাত্ম্য, সৌন্দর্য্য এবং রহস্য আমার হৃদয়ে আঘাত করিতে লাগিল। সহসা দুটা-একটা দরজা খুলিবার শব্দ হইল। ভোর? লাফ দিয়া উঠিয়া জানালায় গিয়া দেখি স্পষ্টই ভোর! ঐ যে বিচিত্র নীলপোষাকে সুইপারগণ চলিয়াছে। আমার ম্যান্ শীঘ্রই চা লইয়া আসিল। আমি চা সারিয়া হাতমুখ না ধুইয়াই রবার্টের কামরার দিকে উঠিয়া গেলাম। কামরার কাছে যাইতেই শুনি—বেহালা ও গান। দরজা তখনো বন্ধ। জানালা হ্রদের দিকে খোলা, রবার্ট বুঝি রাত্রে আর ঘুমায় নাই। আমি চুপ করিয়া অনেকক্ষণ শুনিলাম—ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া সেই একই গান বারবার গাহিতেছে। গানটি ধরিলাম, যথা :—

By woodland-bar by ocean-belt

The full south breeze our foreheads fann'd

And lightly rolled round moon and star,

Low music from the magic-land,
By ocean-bar by woodland-belt
More fragrant grew the glowing night
While, faint through dark blue air we felt
The breath of some unnamed delight.
Till morning rose and smote from afar
Her elfin harps. Then sea and sky
And woodland-bar and ocean-belt
To one sweet note sang 'th' valley.'

ঐ দেখুন কোথায় হ্রদের উপর ভাসিয়া 'woodland-bar, ocean-belt' ছাড়াইয়া প্রতীচীর সমুদ্রাকাশের গীতস্বরে উদ্বোধিত কোন একটি সুন্দর উপত্যকায় রবার্টের চিত্ত অবরোহণ করিতেছে। ঐ সেই বিশাল হ্রদ—কুণ্ডলায়মান কুয়াশার উপর সূর্য্যকিরণ পড়িয়া বোধ হইতেছে, যেন কে এই বিরাট্ কটাহে এই বিপুল জলরাশি উত্তপ্ত করিয়া বাষ্পায়িত করিতেছে!—আজ বাঙ্লাদেশে বসিয়াও মনশ্চক্ষে দেখিতেছি, ঐ সেই আন্দোলিত দীর্ঘোর্ম্মিমালা—ঐ দূরে পরপারে সেই উপত্যকাটিকে ক্রোড়ে লইয়া সেই সুরেন্দ্রগণরক্ষিত দৈত্যজন্মার ন্যায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ শৈলরাজি দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

—•—

রাজকন্যা।

এক ছিল রাজকন্যা। কই, তাহাকে তো আর দেখিতে পাই না। একখানি গল্পের বই লই—একি!—কেবল যত সুরবালা, কমলমণি, ললিতা, নলিনী, নগেন্দ্র, বীরেন্দ্র, মনোমোহনের গল্প! কলিকালে কাংস্যপাত্রে ভোজন শাস্ত্রে লিখিত আছে—কলির শেষে কি অবশেষে এই সব সুরবালা পুরবালা রাজকন্যার সিংহাসনও অধিকার করিয়া বসিবে? সে রাজকন্যা কি পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া রাজপুত্রের সঙ্গে সাতসমুদ্র পার হইয়া চিরদিনের জন্য পলায়ন করিয়াছে? না, এই রেলগাড়ি ষ্টীমার প্রভৃতির আক্রমণে সাতসমুদ্র সাতটি কূপমাত্রে পরিণত হইয়া গিয়াছে—রাজকন্যাদের গোপন ভবনগুলির পাশ দিয়া ইলেকট্রিক ট্রাম চলিয়াছে এবং এই যে ললিতা গলিতা প্রভৃতি নায়িকাগণ, ইহাদিগকেই এখন রাজকন্যা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে? রাজকন্যাগণের ইতিহাস হঠাৎ কেন বন্ধ হইয়া গেল? আমি ত কোনো ইতিহাসের এক পৃষ্ঠাও পড়িতে পারি না—এবং নিশ্চয় বলিতে পারি তারাপতিত কৃষ্ণকন্যার মত সুন্দরী কাশ্মীররাজকুমারী ক্লিওপেট্রার কাহিনীসংবলিত রোমের ইতিহাস পাঠ্য না থাকিলে আমি কিছুতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা বিশেষে উত্তীর্ণ হইতে পারিতাম না।

এক ছিল রাজকন্যা। কবে ছিল কেউ জানে না, কিন্তু তাহার ইতিহাস ত লিখিতে এবং শুনিতে এতকাল চলিয়া আসিতেছিল! "শাল-সরল-[illegible]" হিল্লোলে রক্তাশোকতরুর মূলে

বসিয়া বৃদ্ধঋষি শ্রুতি শুনাইতেন—শিষ্যমণ্ডলীর বুক থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিত—বৃদ্ধা দিদিমাও কোমলতম বর্ণনিশ্রণের মধ্যে সন্ধ্যাকালে ছাদে বসিয়া রাজকন্যার শ্রুতি কীর্ত্তন করিতেন, নাতিমণ্ডলীর বুক কি করিয়া উঠিত, এই প্রবন্ধই তাহার পরিচয়রূপে গণ্য হউক।

বাস্তবিক পুরাতন ইতিহাসবেত্তাদের পরে বুড়া দিদিমাই রাজকন্যার প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিলেন। তখন সমস্ত পায়রাগুলি বাসায় ফিরিয়া আসিয়াছে—তাহাদের পাখার ঘোর ঝটপটি এবং তুমুল বক্‌বকম্ শেষ করিয়া অন্ধকারের মধ্যে যে যার আপন খোপে বসিয়া গিয়াছে;—দূরে সন্ধ্যার অন্ধকার হইতেও ঘনতর শীতল রসে চক্ষুকে সিক্ত করিয়া দেবদারু গাছগুলি দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের পশ্চাতে পীতপাণ্ডুবর্ণের বর্শা ছাড়িয়া দিয়া দ্রুতবেগে চাঁদ উঠিয়াছে; পশ্চিমকোণের সিন্দুরাভা ক্রমেই বৃদ্ধের চক্ষুর মত অন্ধকারের মধ্যে ঘোলা হইয়া যাইতেছে; উপরে একটিমাত্র তারা, আমার মাথার মধ্যে দিদিমার একটি অঙ্গুলি শিথিলভাবে চরিয়া বেড়াইতেছে—তখন দিদিমা আরম্ভ করিলেন, এক ছিল রাজকন্যা।

দিদিমার সেই শ্রুতি মনে লইয়া ক্রমে আমাদের রাজকবিগণের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল। দিদিমার এবং রাজকবিদের বর্ণনাগুলি মিলাইয়া দেখি, রাজকন্যার কি মহিমা! কত বিচিত্র নদনদী, কত রহস্যময় প্রাসাদকক্ষ, কত অদ্ভুত ষড়যন্ত্র, কত করুণা, কত অনুনয়, কত দীর্ঘ ভ্রমণান্তে মিলন, কত পলায়ন! কত পুরাতন প্রাসাদের পশ্চাৎস্থিত গুপ্ত অলিন্দে সহচরীসহিত রাজকন্যা এই সান্ধ্য পান্থের নেত্রহরণ

করিয়াছিল,—হায়, প্রতীক্ষাপরা ধৈর্য্যশীলা রাজবালিকা,—তোমার প্রাসাদবলভিকার কুলায়প্রত্যাগত শুভ্র পারাবতের মত আমার হৃদয়ের সকরুণ আশীর্ব্বাদগুলি সেই অনতিধূসর সন্ধ্যার মধ্য দিয়া পত্রপুষ্পতরুর আড়াল দিয়া, শুভ্রপাখা উড়াইয়া তোমার দেহবল্লরীর চারিদিকে গিয়া ভিড় করিয়াছিল।

কত মরুভূমির প্রান্ত ধরিয়া রাত্রির অবসানসময়ে ধূম্রশ্বেত তারা-গ্রামের নিম্ন দিয়া অসিলতার মত কৃশাসুন্দরী অসিচর্ম্মধারী তাতার-কুমারের ঘোড়ার পাশাপাশি ঘোড়া ছুটাইয়া দীর্ঘগ্রীবা দীর্ঘতর করিয়া কালো পর্ব্বতের উপত্যকাভিমুখে ধাইয়া চলিয়াছিল,—হায়, পলায়নপরা উদ্দাম সম্রাটদুহিতা, আমার হৃদয়ের উৎসাহ বিদ্যুদ্দীপ্তি ধারণ করিয়া তোমার নেত্রবিদ্যুতের খরবক্র পথে নিঃক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিল! বর্ষার মেঘ কাঁদিয়া নিঃশেষ হইয়াগেল, উচ্চপ্রাসাদকক্ষে রাজবালিকার অশ্রু শরৎ-হেমন্ত শীত-বসন্তের অবসানেও সমান ঝরিতেছে! সহস্র ভক্ত পূজা সাঙ্গ করিয়া, বর লইয়া, ফল লইয়া ঘরে ফিরিয়া গেল—তবু এই বিজন শরৎরাত্রির অশ্রুস্নাত অনন্তজ্যোৎস্নার মধ্যে দাঁড়াইয়া সরোবরতটে একাকিনী রাজকন্যা ফুল তুলিতেছে! তরলাক্ষি, তুমি যখন সৈরিন্ধ্রী বেশে এক রাজভবন হইতে আর এক রাজ-ভবনে ফিরিয়া তোমার হারান ধনের অন্বেষণ করিতেছিলে—মধ্যাহ্নে বিশ্রামতন্দ্রায় রাজপুরী নীরব—তখন বাগানের বৃক্ষশাখার ভিতর হইতে আমিই শুকের মত রক্তচঞ্চু বাহির করিয়া, বিস্রব্ধভাবে ঘাড় বাঁকাইয়া তোমার অনিমেষ অশ্রুকলুষিত চক্ষুদুটি নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। চপলাক্ষি, তুমি যখন প্রগল্ভ বণিককুমারের বেশে

সিডনের বন্দরে আপণ হইতে আপণান্তরে ফিরিয়া, মণিতরল করনখে মণিমুক্তার প্রতিবিম্ব ধরিয়া জহরৎ কেনার ছলনা করিতেছিলে—তখন আমিই আপন দ্বারস্থিত উচ্চ্রায়াঙ্কিত রঞ্জিত গ্রীক্ মৃৎপাত্রোপরি পার্শ্বে ভর রাখিয়া অ্যাপোলো-প্রতিম গ্রীকযুবার দৃঢ়সুন্দর মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া তোমার বেণীগোপন উষ্ণীষটিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছিলাম। আমি দেশে বিদেশে রাজকন্যাগণের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়াছি, আমি তাহাদের রহস্য জানি। বাল্যকালে, যখন মুখের গঠন ভাল করিয়া ফুটে নাই,—ভাব তরল জলের মত সর্ব্বাঙ্গে ছলছল করিয়া বেড়াইত, তখন হইতে রাজকন্যার প্রতিবিম্ব আমাদের হৃদয়ের মধ্যে পড়িয়াছে। আমাদের ভাবোদ্বোধিত যাহা কিছু সৌন্দর্য্য, তাহা অমর, তাহা কোনদিন যাইবে না। রাজকন্যা সেইরূপ আমাদের একটি চিরদিনের জিনিস। ব্যবধানই ইহার সৌন্দর্য্যের চারিদিকে ইন্দ্রজালের ঘের টানিয়া দিয়াছে। রাজকন্যাগণ কোন্-একটি দূর বাগানের মধ্যে প্রাসাদের কক্ষে চিরকাল বাস করিতেছে। জ্যোৎস্না এবং রৌদ্রে সুখ-স্পর্শ ছায়া ফেলিয়া সে বাগানের চারিদিক্ যেমন বৃক্ষমালা, স্তব্ধতা এবং মর্ম্মরে ঘিরিয়া রহিয়াছে, তেমনি তাহাদের চতুর্দ্দিকে আরও কত বেড়া! রাজকন্যাকে ঘিরিয়া তাহার নিজ হৃদয়ের প্রণয়লজ্জার বেষ্টন, পিতার আদেশের বেষ্টন, কুলমর্য্যাদার বেষ্টন! পৃথিবীর বলবান্ রাজপুত্রগণের হৃদয়গুলির পক্ষে এই সব মধুর এবং কঠোর বেষ্টন ভেদ করিবার প্রলোভন কি দুঃসাহসোদ্দীপক! অদৃষ্ট রাজকন্যার মোহে শতশত নদী পর্ব্বত পিছে ফেলিয়া রাজপুত্র চলিয়া যায়।—আবার একএকদিন সন্ধ্যাকালে নদীকূল দেখিয়া

রাজকন্যার চক্ষুদুটির কারুণ্য রাজপুত্রের হৃদয়ের মধ্যে গলিয়া আসে। তখনি আমরা হঠাৎ রাজকন্যাকে আর একভাবে দেখিতে পাই। দেখিতে পাই, রাজকন্যা একাকিনী। নানাবেষ্টনের মধ্যে উপগূঢ় রাজকন্যা ব্যবধানের জন্য বাহিরের সকলের কাছে যেমন চিরবিস্ময়কর এবং বলবান্ রাজপুত্রের কাছে যেমন দুঃসাহসোদ্দীপক তেমনি আপনার কাছে সেই ব্যবধানের জন্যই কি নিতান্ত করুণ নহে? জানি, তাহার অলঙ্কার শিঞ্জিতভাবে তাহার প্রতি অঙ্গের সৌষ্ঠবের স্তুতি গাইয়া থাকে; জানি, সখীগণ তাহার কানে সর্ব্বদাই মধুরালাপ বর্ষণ করিয়া থাকে; বুঝি, তাহার নিভৃত মর্য্যাদাময় অবস্থানে তাহার সম্ভোগসুখকে অবারিত করিয়া দেয়—তবু কি হঠাৎ একদিন আরতির সন্ধ্যায় রাজকন্যার বুকের মধ্যে সন্ধ্যাতারা ফুটিয়া উঠে না? মনে হয়না, এই ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্য তাহাকে চিরকাল এক কাব্যলোকের মধ্যে নির্ব্বাসিত করিয়া রাখিবে? হঠাৎ রাত্রির অন্ধকারে রাজার হর্ম্ম্য এবং দরিদ্রের কুটীর এক সমান অস্পষ্টতায় মিলিয়া গেলে, মনে হয় না, ঐ ধরণীর পথ সুন্দর, উহারি মধ্যে বাহির হইয়া পড়ি, ঐপথে সংজ্ঞেই হৃদয়বানের সন্ধান পাইব? কিন্তু থাক্—তাহাতে কাজ নাই। রাজবালিকার চিন্তা কার্য্যে পরিণত না হইয়া স্বপ্নেই পর্য্যবসিত হোক্। তুমি তোমার দুর্ভেদ্য বেষ্টনাবলীর মধ্যে অবরুদ্ধ থাকিয়া বলদর্পিত রাজকুমারগণকে অদ্ভুত দুঃসাহসিকতায় প্রবৃত্ত কর এবং আমরা রাজপুত্র না হইয়াও তোমাদের কাহিনী পড়িয়া দুঃসাহসিকতা এবং প্রেমের জটিল ব্যূহমধ্যে আপনাদিগকে একবার ছুটাইয়া দি। রাজকন্যা

চিরকাল পরে পরে তাহার সুখ এবং বেদনা লইয়া বাস করুক—প্রাসাদশিখর হইতে নামিয়া পৃথিবীর উপরে বাহির হইয়া না পড়ুক—সুরবালা এবং পুরাবালাতে কাব্যজগৎটি পরিপূর্ণ হইয়া না যাউক্। আমি সুরবালা-পুরবালাদের অধিকার সঙ্কুচিত করিতে চাই না; তাহাদের আমি অভক্তও নহি—কিন্তু সেই পুরাতন রাজকবিগণ এবং বৃদ্ধা দিদিমাদের আশ্চর্য্য বর্ণনায় আমাদের হৃদয়ের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী রাজকন্যা তৈয়ার হইয়া গিয়াছে—হঠাৎ বাল্যসন্ধ্যার বর্ণ-প্রবাহের অন্তরাললক্ষ্য তাহার ঐ সৌধচূড়া হইতে দৃষ্টি নামাইয়া, আধুনিক কাব্যজগতের দিকে চাহিলেই অনিবার্য্য প্রশ্ন উঠে,—এক যে ছিল রাজকন্যা? সে কোথায় গেল? কোথায় গেল সেই চতুরা সখীবর্গ! কোথায় গেল তাহাদের পিঞ্জরস্থ স্ফুটবাক্ পাখী, কোথায় গেল সেই দুঃসাহসী অশ্বারোহী রাজকুমার!—

—•—

আরো একটি কথা।

[ONE WORD MORE.]

(By Robert Browning.)

যদি পুনর্জন্ম মানিতে হয় এবং বিশ্ব পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, এরূপ যদি বিশ্বাস করি, তবে শেলী ব্রাউনিংরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ মনে করিতে পারি না কি? পারি—যদি আজ ব্রাউনিংএর জন্মতারিখ এবং শেলীর মৃত্যুতারিখ আমাদের স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়—কারণ রবার্ট ব্রাউনিং শেলীর মৃত্যুর দশ-বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

Paulineএ যে উদার গভীরস্বরে, যে মর্ম্মান্তিক প্রেমে ব্রাউনিং শেলীর আত্মার উদ্দেশে "Sun-treader—life and light be thine for ever" ইত্যাদি বন্দনগীত গাহিয়াছেন; Sordelloর প্রারম্ভে, বৃহৎ অনুষ্ঠানের মুখবন্ধে, নমস্ক্রিয়ামুখে ডান্টের সহিত শেলীর যে উল্লেখ করিয়াছেন,—কিংবা Memorabilia নামক ক্ষুদ্র খণ্ড-কবিতায় সুন্দর সংক্ষিপ্ত ভাবে তাঁহার যে মহাপুণ্যস্মৃতি ব্যক্ত করিয়াছেন—এ সমস্ত নিগূঢ় অনুভবের কথা ছাড়িয়া দিলাম। অথবা গদ্যপ্রবন্ধে ব্রাউনিং যে শেলীকে বুঝাইতে যত্ন পাইয়াছিলেন, সে কথাও ত্যাগ করিলাম। এ সব ছাড়িয়া দিয়াও যেন দেখা যায় যে, সেই স্বাধীনতার উৎসব, সেই প্রেমের আবেগ, সেই সৌন্দর্য্যের সুগভীর অনুভব সেই wind-grieved Apennines গিরিমালার প্রত্যন্তশয়ানা ইটালীর প্রতি ভালবাসা—এ সকলই যেন শেলী হইতে আসিয়া

কবিতা এবং জীবন দৃঢ়রূপে মিলিত করিতে না পারিলে, সেই সিদ্ধির শেষ কথাটি বলা কাহারও সাধ্য হয়, আমি বিশ্বাস করি না। ড্রামা পড়ি, ড্রামাটিক লিরিক পড়ি, রবার্ট ব্রাউনিংএর অন্যান্য কবিতা পড়ি—গদ্যে, ভাবে সর্ব্বত্রই একটি সুপ্রতিষ্ঠিত শান্তি—একটি স্থির, নিগূঢ়রূপে উপভোগ্য সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই—এই সমস্ত সৌন্দর্য্যের, রবার্ট ব্রাউনিংএর সমস্ত মনোহর সাহিত্যটির কেন্দ্রবন্ধ, স্থিতির অবলম্ব এই 'একটি কথা'তে অনুভব করা যায়। এই বিচিত্র সুন্দর কবিতা-টির একবার আদ্যন্ত অনুধাবন করা যাউক।

কবি পঞ্চাশটি নরনারীর ছবি আঁকিয়াছেন। অবশ্য সত্যকথা বলিতে গেলে, এই পঞ্চাশটি নরনারীর অধিকাংশই রবার্ট ব্রাউনিংএর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। সুন্দর, সুরসিক, পবিত্র, প্রেমিক, স্থির, বিশ্বাসী—এরূপ একটি চরিত্রের এক এক ভাগ চিত্রিত করিলে যত-গুলি চিত্র হয়, অধিকাংশ নরনারীই তাহার একটি বা আর একটির সঙ্গে মিলিবে—অবশ্য ডিটেলে বিভিন্নতা না আছে, এমন নহে। যাক্ সে কথা—কবি এবার স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন,—উপস্থিত হইয়া আপনাকে চিত্রিত করিতেছেন। কাব্যে একটা চরিত্রচিত্র করিতে হইলে, তাহার যাহা মূল, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবন, একেবারে তাহাতেই গিয়া আঘাত দিতে হয়। কবি নিজেকে চিত্রিত করিতেছেন, এ কথা কেবল আমরা বলি, তাহাই নহে; কবি নিজেও জানেন যে, তিনি আপনাকে এবার বাহির করিয়া দেখাইতেছেন। তাই তিনি তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্ভোগের কথা বলিতেছেন। কারণ উহাদ্বারাই জীবনটা বুঝা যায়। বিদ্যাপতিকে যদি তাঁহার স্বরূপ জিজ্ঞাসা করি,

তবে "আমি শিবসিংহ রাজার সভাকবি ছিলাম," এ উত্তরে কিছুই জানা যায় না—পরন্তু বিদ্যাপতির উত্তর—'জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।' মাইকেলের উত্তর—'জীবনউদ্যানে তোর যৌবনকুসুমভাতি কতদিন রবে!' শেলীর উত্তর—'The desire of the moth for the star'—রবার্ট ব্রাউনিংএর উত্তর—এই One word more to E. B. B.।ব্রাউনিংএর উত্তর—

The novel
Silent silver lights and darks undreamed of
Where I hush and bless myself with silence.

সেই চমৎকার
নীরব রজতশুভ্র স্বপ্নাতীত ছায়া আর আলো
যেথা স্বর্গাশিষে ডুবি 'ধন্য মানি' চুপ করে থাকি।

এরূপ শীঘ্র শীঘ্র সারিয়া দিলে কবিতাটির বিচিত্রতা উপলব্ধ হইবে না। Mrs. Sutherland orr বলেন যে, এক কথায় ব্রাউনিংএর কবিত্বশক্তি বুঝাইতে গেলে বলা যাইতে পারে, "বাস্তবের উপর অবাস্তিতরূপে কল্পনার প্রতিপাদান" সেই একটি কথা। এই উক্তির প্রমাণ আমাদের আজিকার আলোচ্য কবিতাটিতে বিশেষরূপে দেখা যাইবে। চতুর্দ্দিক হইতে কত মূর্ত্তি, দৃশ্য, ক্রিয়া আসিয়া একটি ভাবকে পরিস্ফুট করিয়া যায়। কীট্‌সের হাতে যেমন 'all beauty with an easy spau' সমস্ত সৌন্দর্য্য একটি সহজব্যাপ্ত আকর্ষণে উঠিয়া আসিত, ব্রাউনিংএর মনেও তেমনি নানা সুন্দর চিত্র সঙ্কিস্থে সহজে আসিয়া সমুদিত হয়। অবশ্য কীট্‌স্‌এ ব্রাউনিংএ মধ্যেই তফাৎ

আছে। যাক্, আজিকার এই কাব্যখণ্ডে এই বিচিত্রতার উপলব্ধির জন্য,—বারংবার সমালোচনার প্রতিবন্ধে প্রতিহত হইলেও, একবার শেষ পর্য্যন্ত যাইব।

কবি বলিতেছেন যে, চিত্রকর র‍্যাফেল একবার একখানি চতুর্দ্দশপদীর কাব্য লিখিয়াছিলেন, ড্যাণ্টে একবার একটি ছবি আঁকিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এস আমরা নিরবচ্ছিন্ন ম্যাডোনার ছবি দেখা ছাড়িয়া দিয়া একবার ঐ কবিতাটি পড়ি। এস আমি আর তুমি ড্যাণ্টের একখানা নূতন ইন্‌ফার্ণো (Inferno) পাঠ ত্যাগ করিয়া ঐ ছবিটি একবার দেখি—কিন্তু সে বই হারাইয়া গিয়াছে, সে ছবি আঁকা হয় নাই—আর দেখা যাইবে না।

ইহার অর্থ কি? র‍্যাফেলের কাব্য, ড্যাণ্টের ছবির কথা কেন বলিলাম? অর্থ কি?

অর্থ এই যে:—সেই এতক্ষণ যাহা বলিয়া আসিতেছিলাম,—সেই শেষ কথাটি, সেই গূঢ়তম কথাটি। সে কথা সব সময়ে বলা যায় না। একবারমাত্র, একদিনমাত্র বলা যায়। রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দে চঞ্চল সংসার, নরনারীর কর্ম্মকাণ্ডে বিক্ষুব্ধ সংসার,—নিগূঢ়, মৌন ভাবজীবনের এতই বিসংবাদী যে, সে কথাটি একবারমাত্র বলা সম্ভব। একদিন দিগন্ত বড় গম্ভীর হইয়াছিল, বর্ষাসিক্ত পৃথিবীতে অপ্সরোরাজ্যের আলো পড়িয়াছিল, সেইদিন প্রকৃতির কবি বলিয়াছিলেন—

"এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরষায়।"

একদিন ঘননীল মেঘে উদয়পথ ঢাকিয়া গিয়াছিল, গগনে মসীকৃষ্ণ

এক অতুল গাম্ভীর্য্যে অবগাহন করিতেছিল, সেদিন প্রকৃতির কবি বলিয়াছিলেন—

"আর—
বলিতাম জীবনের যত কথা আছে
বচনে পড়িত নীল জলদের ছায়
ধ্বনিতে ধ্বনিত আর্দ্র উতরোল বায়।"

আপনার হৃদয়ের জোরের কথা থাক্, প্রকৃতির কবির কাছে বাহ্যিক প্রকৃতির এতটা আয়োজনের পর তবে সে কথাটি বলা যায়। এই শেষ কথাটি তাই অল্প লোকেই বলিতে পারে। প্রথমতঃ রবার্ট ব্রাউনিং এর ন্যায় শশীর প্রণয়ের উপযোগী হওয়া চাই, তার পরে আবার এলিজাবেথ ব্যারেটের মত কবিকুলের শশী আসিয়া মিলা চাই,—তবেই এই "জীবনমরণময় সুগম্ভীর কথা," না, এই অনন্ত-জীবনময় সুগম্ভীর সুমধুর কথা ব্যক্ত হইতে পারে।

কবি বলিতেছেন যে, জীবনে একটিবারমাত্র জীবনের সমস্ত কর্ম্ম, সমস্ত অধ্যবসায় হইতে পৃথক্ করিয়া, একটি নূতন সুরে একজনকে মাত্র একটি কথা বলিতে ইচ্ছা হয়। র‍্যাফেলের কাব্য, ড্যান্টের ছবি তাহাই। তাঁহাদের প্রতিদিনকার ব্যাবহারিক জীবন ত্যাগ করিয়া একবার তাঁহারা তাঁহাদের নিগূঢ় মানবজীবনের আস্বাদে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন।

কেন? ব্যাবহারিক জীবন ত্যাগ করিতে চান্ কেন? না—বহিঃসংসারে তুমি যতই বড় কাজ কর না কেন—পাহাড় গুঁড়াইয়াই ডাও আর নদীই বহাও—যাহাই কেন কর না—প্রেম কোথায়?

শতসহস্র লোক তোমার কীর্ত্তিমণ্ডপতলে আসিতেছে-যাইতেছে—তবু সমালোচনা ছাড়িবে না! বাস্তবিক অতগুলি লোক একত্র হইয়া কি ভালবাসিতে পারে? বাস্তবিক অতগুলি লোককে একত্র করিয়া কি ভালবাসা যায়? পরিপূর্ণতম মিলনের যে সুগভীর আনন্দ, শুধু কর্ম্মবীরের জীবনে তাহা কোথায়? সংসারে কাজ কর, বড় হও, বিরাট্ হও—মুশার মত সিনাই-শৃঙ্গে দাঁড়াইয়া অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির বিশ্বাসবার্ত্তা জগতে ঘোষণা কর! ঐরূপেই সাধারণের উপর জ্বলিয়া উঠিতে হয়—মুশা সে বেশ কাজ করিয়াছিলেন। তথাপি মুশা যদি একবার জীবনে ভালবাসিয়া থাকেন—সে সুন্দরী য়িহুদীকেই হোক্, আর ইথিওপীয়া দাসীকেই হোক্—একবারমাত্র যদি জীবনে ভালবাসিয়া থাকেন, তবে ঐ যে ধীর মূক উষ্ট্র মরুতৃষায় প্রাণ বাঁচাইতে আপনার জন্ম জলভার বুকের কাছে সঞ্চিত রাখিয়াছিল, কিন্তু মরুমধ্যে উপস্থিত হইয়া তৃষাতুরা উষ্ট্রীর জন্ম হাঁটু ভাঙিয়া বুকটি খুলিয়া জলসঞ্চয় বিসর্জ্জন করিতেছে—ঐ উষ্ট্রটির মত হইবার জন্ম মুশা কাতর হইতেন। অতঃপর কবি বলিতেছেন—তবে আমি কি করিব? আমি এতদিন কবিতার ব্যবসায় করিয়াছি—এখন কি তাহা ছাড়িয়া আর কোন নূতন সুরে মর্ম্মকথা জানাইব? না না, যে কদিন জীবন আছে, আর ছবিও আঁকিব না, স্থাপত্যে ও মনোনিবেশ করিব না—একটি জীবনে আমার কবিতার বেশী কুলাইবে না। কিন্তু আমার আশা আছে, তুমিও কবি। তুমি কবিতার মর্ম্ম বুঝিবে। আমার নিগূঢ়, নূতন কথাটি তুমি না বুঝিবে, এমন নহে। দেয়ালে মোটা মোটা ছবি আঁকা যাহার অভ্যাস, সে হয়ত একদিন একটি সূক্ষ্ম কেশতুলিকা

চুরি করিয়া তাহার প্রিয়তমার জন্য একটি সূক্ষ্ম চিত্র আঁকিতে পারে—বড় মোটা পিতলের বাঁশীতে যে স্থূল সুর বাজাইয়া ফিরে, সে হয় ত একদিন রজতবংশীরন্ধ্রে সুকোমল সুর উদ্বোধিত করিয়া রাজকুমারীর বাতায়নতলে প্রভাতী গান করিতে পারে—আমারও আজিকার কবিতা সেইরূপ আমার অন্যান্য কবিতা হইতে পৃথক। এতদিন মোটা মোটা সুরে নানা বেশে নানা চরিত্রে নানা কথা বলিয়াছি, এবার আমি স্বয়ং রবার্ট ব্রাউনিং বলিতেছি। কথা বেশী কিছুই নহে—"এই বহিখানি তুমি লও, যেখানে আমার প্রাণের চিরনিবাস, সেখানে আমার কবিকীর্ত্তিও আশ্রয় গ্রহণ করুক"—এইমাত্র। এ কথা আর বেশী কি? তবু এই আমার সব! ইহা-তেই সব ব্যক্ত হইবে, কারণ তুমি যে আমাকে জান।

জানার কথায় কবির একটা উপমা মনে উদিত হইল। (কবিতাটি রাত্রে লিখিত হইয়া থাকিবে।) ঐ দেখ চন্দ্র! ইটালীতে—ফিসোলের বর্ণতরঙ্গবন্ধুর সন্ধ্যাকাশে চন্দ্রকলা ধীরে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। আকাশে বহিয়া গিয়া স্যামানিয়াটোর উপর পরিপূর্ণ দীপনে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, সাইপ্রেস-কুঞ্জের মধ্য দিয়া গোল হইয়া দেখা দিতেই নাইটিংগেল্‌গণ গান করিয়া উঠিয়াছিল—আর আজ এই লণ্ডনের গৃহছাদগুলির উপর দিয়া সেই ইটালীয় চন্দ্রের ভগ্নাংশমাত্র, কৃপণের অশোভন-মিতব্যয়কৃত দানের রৌপ্যখণ্ডের ন্যায় দৌড়াইয়া যাইতেছে—যেন মরিতে পারিলেই সুখ। এ চন্দ্রে কি দেখিবার কিছুই নাই? অবশ্য আছে। কিন্তু ঐ চন্দ্র যদি একটি মানুষকে ভালবাসিত, তাহা হইলে—একি রূপ!—এক সম্পূর্ণ নূতন, চমৎকার রূপে তাহার

কাছে আপনাকে প্রকাশ করিত। শিকারী কি মেষপালক, ভক্ত জোরোয়াষ্টার, জ্যোতিষী গ্যালিলিও অথবা কবি কীট্‌স্‌—সেই এণ্ডাই-মিয়নের কবি কীট্‌স্‌ও যাহা দেখেন নাই—এমন একটি রহস্যপূর্ণ রূপ সেই প্রণয়ীর চক্ষুগোচর হইত।

কি দেখিত! সমুদ্রবাহী বরফস্তম্ভ (Iceberg) যেমন স্রোতে বহিয়া আসিয়া সহসা জাহাজের উপর পড়িয়া জাহাজ চুরমার করিয়া দেয়, তেমন কোন একটা আবেগ? না, শুভ্রনীল মর্ম্মরবদ্ধ মণ্ডপতল, অনন্ত রহস্যে পূর্ণ,—যাহা সেই হিব্রু ঋষিগণ, যাহা মুশা ঈশ্বরের পাহাড়ে উঠিয়া দেখিয়াছিলেন—তেমনি একটি কিছু? কেহ জানে না। কিন্তু এটি স্থির যে, ফ্লোরেন্স্‌ এবং লণ্ডনে যাহা দেখা যাইতেছে, তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ আর কিছু দেখা যাইত। ধন্য ঈশ্বর যে, তোমার ক্ষুদ্রতম প্রাণীরও আত্মার দুটি ভাগ আছে—একটি সংসারের জন্য, একটি তাহার প্রিয়তমা নারীর জন্য। কর্ম্মের জগৎ, শক্তির বিকাশ ও ক্রীড়ার জগৎ—এর মূলে যেন অচলপ্রতিষ্ঠ, রহস্যময়, সুশীতল প্রেমের জগৎ বর্ত্তমান। ধন্য ঈশ্বর যে, ক্ষুদ্রতম প্রাণীরও আত্মায় সেই দ্বিবিভক্ত মহিমার সুসঙ্গত প্রতিবিম্ব পতিত হইতে বিধান করিয়াছ।

কবি বলিতেছেন, এই ত গেল আমার কথা—এখন তোমার কথা ভাবিয়া দেখ। হে আমার কবিমণ্ডলের শশি!—কিন্তু কবিত্ব—সে ত সংসারের দিক্‌! আমি সংসারে দাঁড়াইয়া সেখানকার লোকের সঙ্গে ওদিকের প্রশংসা ত করিয়াছিই, কিন্তু—

But the best is when I glide from out them,

Cross a step or two of dubious twilight
Come out on the other side, the novel
Silent silver lights and darks undreamed of
Where I hush and bless myself with silence.

তখনি কৃতার্থ মানি, যখন তাদেরে ত্যজি ধীরে
আধ-আধ গোধূলীর ছায়ালোকে চলি' কিছুদূর
এসে পড়ি আর পাশে অকস্মাৎ—সেই চমৎকার
নীরব, রজতশুভ্র স্বপ্নাতীত আলো আর ছায়া !
যেথা স্বর্গাশিষে ডুবি' ধন্য মানি' চুপ হয়ে থাকি ।

অতঃপর কবি আনন্দের সুর পরিপূর্ণতম করিয়া একটি উল্লাস দিয়াছেন । যথা :—

সেই ম্যাডোন-আঁকা রাফেল একটি গীত লিখিয়াছিলেন, আমি মাথার মধ্যে তাহাই গাহিতেছি—সেই ইনফার্ণোর কবি ডাণ্টে একটি পরীর ছবি আঁকিয়াছিলেন—দেখ তাহা আমি বক্ষে ধারণ করিয়া ফিরিতেছি । এইখানেই কবিতাটির সমাপ্তি ।

বিবাহ ত সংসারে প্রতিদিনই হইতেছে । বর্ব্বর হইতে আরম্ভ করিয়া ঋষি পর্য্যন্ত সকলেই ত বিবাহ করিতেছে । বিবাহ সম্বন্ধে অনেকের অনেকানেক মত ত শুনিয়াছি । হিন্দুদের বিবাহোদ্দেশ্যের প্রশংসা শতশতমুখে শুনিতে পাইয়াছি, ওদিকে আবার সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের 'ক্রুটজার্ সনাটা' গ্রন্থও পড়া যায় । কিন্তু সেই বিবাহের —এ কি স্বীকার্য্য নহে যে, বিবাহ অধিকাংশ স্থলেই বিকৃত, আদর্শের পন্থা হইতে বিচ্যুত এবং বীভৎস ? —সেই বিবাহের উপর কে এমন

মধুর-গভীর আলোপাত করিতে পারিয়াছে? জীবনে ও কবিতায় যে মিল, সে অতি বিরল—'One word more' সেইজন্যই অন্তত আমার কাছে এত মনোরম—এমন সুধাময়। পাঠকপাঠিকাগণ! সাধ্যানুসারে আজ আপনাদিগকে ব্রাউনিংএর একটি কবিতা উপহার দিতে যত্ন পাইলাম। আপনারা ব্রাউনিংএর মর্ম্ম ইহাতে কতদূর অবগত হইবেন, জানি না, কিন্তু আমি এই কবিতাটিকে ব্রাউনিংএর একটি অত্যাশ্চর্য্য স্বাভাবিক কবিতা বলিয়া অনেকদিন হইল বাছিয়া লইয়াছি। ইহার সঙ্গে এখন সেই 'কবিমণ্ডলের শশী' ব্যারেট ব্রাউনিংএর একটি কবিতা তুলিয়া দিলে আমার প্রবন্ধ পরিপূর্ণ হয় না কি? এ কবিতাটি কাহার প্রতি লেখা হইয়াছে, সহজেই বুঝা যাইবে :—

How do I love thee? Let me count the ways.
I love thee to the depth and breadth and height
My soul can reach, when feeling out of sight
For the ends of Being and ideal Grace.
I love thee to the level of every day's
Most quiet need by sun and candle-light.
I love thee freely as men strive for Right;
I love thee purely as they turn from praise
I love thee with the passion put to use
In my old griefs, and with my childhood's faith.
I love thee with a love I seemed to lose
With my lost Saints,—I love thee with the breath

Smiles, tears, all my life ! and, if God choose,
I shall but love thee better after death.

অতঃপর আশা করি, সেই novel silent silver lights and darks সেই 'চমৎকার নীরব রজতশুভ্র আলো আর ছায়া'র মর্ম্ম কিছুকিছু বুঝা যাইবে।

—•—

প্যারাসেল্‌সাস্‌।

[Paracelsus.—By Robert Browning.]

Make no more giants, God! But elevate the race at once!

"হে পরমেশ্বর, আর দানবের সৃষ্টি করিও না, মানবজাতিটাকে একবার তুলিয়া দাও।"

'ব্রাউনিং'এর প্যারাসেল্‌সাসে কথাটি যে অর্থেই প্রযুক্ত হৌক, আমরা কথাটিকে নামাইয়া আমাদের কাজে লাগাইতে পারি। কথাটি 'ব্রাউনিং'এর কবিতাসম্বন্ধে খাটে। রবার্ট ব্রাউনিংএর গান আমাদিগকে কোন পরী কিংবা দেবদানবের রাজ্যে লইয়া যায় না, এই পৃথিবীরই উপরিস্থিত মানবমণ্ডলীর অন্তর-অভিমুখে আহ্বান করে। মানবজীবনের যে অংশটুকু নিত্য—যে অংশটুকু সুন্দর, মহান্‌ অথবা অদ্ভুত, সেই অংশটুকুর উপরেই ব্রাউনিং কল্পনার আলোক ফেলিয়া এমন এক একটি ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিতে পারেন যে, পরী-দেবতার অভাব আমাদের আর অভাব বলিয়া মনে হয় না। মানবজীবনের নিতান্ত জড়সম্পর্কীয় সুখ হইতে আরম্ভ করিয়া—Fine flesh stuff হইতে আরম্ভ করিয়া—গভীর আত্মার প্রেমের স্বাদ পর্য্যন্ত রবার্ট ব্রাউনিংএ পাওয়া যায়। "The whole live world is rife, god, with thy glory"—"জগদীশ; সমস্ত এই জীবন্ত জগৎ তোমার মহিমায় উজ্জ্বল।" এই-ই রবার্ট ব্রাউনিংএর সর্ব্ব কবিতার সারোক্তি। তার পরে মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্যের সহিত ব্রাউনিং মানবজীবনের পাপতাপদুঃখগানও

আয়ত্ত করিয়াছেন। দুঃখের উপরে সহানুভূতি দিয়া কি-যে কোমল বর্ণে দুঃখের চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন—অপরাধের সহিত মনুষ্যহৃদয়ের দুর্ব্বলতা কি-যে যাদুমন্ত্রে তিনি জড়িত করিয়াছেন!—যে, তাহার সৌন্দর্য্যও আমি বর্ণনা করিতে পারি না। তার পরে সমস্ত জীবন্ত ধরণীর আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া ব্রাউনিং বলিয়াছেন—"Greet the unseen with a cheer"—"সেই পরজগৎকে আনন্দস্বরে সম্ভাষণ কর।"

যাহারা জগতের কোন সুখ ভোগ করে নাই—নিরানন্দে জীবন-যাপন করিয়াছে, আর যাঁহারা আনন্দে বলবান্ হইয়া উঠিয়াছেন, এ দুয়ের পরকালে বিশ্বাসে কত প্রভেদ! নিরানন্দজন যেন শিক্ষা-করা আশায়—কিন্তু অন্তরের দৃঢ় প্রতীতিতে নহে—'তরুচ্ছায়ামসীমাখা' পরপারের দিকে অলসচোখে চাহিয়া থাকে; কিন্তু আনন্দবলবান্ মহাজন এ জীবনের সকল আনন্দের উপর চলিয়া সহজেই যেন,—জ্যোতির্ম্ময় পরলোককে নিশ্চিত জানিয়াই যেন, অগ্রসর হইয়া যান। ব্রাউনিং মানবজীবনকে যথাসাধ্য সম্ভোগ করিয়াছিলেন, আশা করি।

আজ যে গ্রন্থখানির আলোচনা করিব, তাহাতে বর্ণিত মহাত্মার জীবনে ব্রাউনিং একটা-বড় সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। প্যারা-সেল্‌সাসের জীবনে ব্রাউনিং এককালে মানবের আশার বিপুলতা, মানবের মহত্ত্ব, মানবজীবনের দুরপনের অসম্পূর্ণতা, জাগতিক নিয়-মের কঠোরতা এবং মানবের অনন্তমুখী উন্নতি—এককালে এতগুলি জিনিষ ব্যক্ত করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। নিয়তির বল এবং তার উপরেও মানবাত্মার আশা এই গ্রন্থে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার

কল্পনাসম্পদ্ ও ভাষাসম্পদ্ অত্যাশ্চর্য্য—তবু ব্রাউনিংএর প্রারম্ভ-কালের লেখা বলিয়া গ্রন্থ যেন কিছু অধিক বিস্তৃত এবং যেন কিছু অধিক বিশদীকৃত। এরূপ একটু অধিক বিশদীকৃত বা বিস্তৃত হইবার আরও কারণ থাকিতে পারে এই যে, ব্রাউনিং কবিতার একটা নূতন পথ অবলম্বন করিতেছিলেন। মানবজীবনের যে একটি রহস্য এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, তাহাকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে পারি, জ্ঞান ও শক্তি, প্রেমের অভাবে কিরূপে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়, এ গ্রন্থে তাহাই দেখান হইয়াছে; প্রেম অর্থে—সমস্ত কোমল মনোবৃত্তি এবং সুন্দর মনোবৃত্তি।

প্যারাসেল্‌সাসকে এতদিন কেহই জানিতে পারে নাই। চারি শতাব্দীর পুঞ্জীকৃত আবর্জ্জনায় এই মহাত্মার জীবনকাহিনী ভীষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ব্রাউনিং সকল জঞ্জাল বিদীর্ণ করিয়া এই মহাত্মার গভীর হৃদয়ের ক্রিয়া বাহির করিয়া দেখাইয়াছেন। পরে প্যারাসেল্‌সাসের যে ইতিহাস দেওয়া গিয়াছে, উহা হইতে এবং তাঁহার গ্রন্থাবলী হইতে প্যারাসেল্‌সাসের বহ্নিমান্ উদ্যম, তাঁহার বিনাশবীজ, তাঁহার এ জীবনে ক্ষণিক বিনাশ, হৃদয়যন্ত্রণায় তাঁহার নরকভোগ, পরিশেষে আশার সঞ্চারান্তে মৃত্যু—প্যারাসেল্‌সাসের এই গভীরতম জীবন ব্রাউনিং বহু পুষ্পপত্রে সজ্জিত করিয়া,—কবিত্বের ইন্দ্রজালে অনুরঞ্জিত করিয়া, প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ বড় জীবন লইয়া কারবার করিয়াই তিনি দেখাইতে পারিয়াছেন—মানুষের বুকে কতখানি ধরে, মানুষ কত বড়! যাঁহারা ব্রাউনিংএর কাব্যরাজ্যে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে প্যারাসেল্‌সাসের

আরও একটু বিশেষ সৌন্দর্য্য আছে। 'প্যারাসেল্সাস্' কাব্যখানি ব্রাউনিংএর প্রথম লেখা—সর্ব্বপ্রথম না হইলেও ঠিক্ তার পরেরই লেখা। তাই ব্রাউনিং-ভক্তগণ দেখিতে পাইবেন—তাঁহার যে কাব্য-রাজ্যে মানবজীবনের আনন্দমহোৎসব চলিতেছে, প্যারাসেলসাস্ ঠিক্ তাহারই সম্মুখবর্ত্তী ধ্বজমাল্যসজ্জিত বিরাট্ তোরণদ্বারের উপযুক্ত বটে।

এখন প্যারাসেল্সাসের কিছু ইতিহাস দিয়া, তার পর কাব্যখানির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে সুইজর্লণ্ডের জর্ম্মাণভাগে আইনসাইডেল্ন্-নামক স্থানে প্যারাসেল্সাসের জন্ম। বাল্যে তিনি মায়ের কাছে ধর্ম্মশিক্ষা করেন,—মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার ঈশ্বরভক্তি অটুট ছিল। পিতা এই বালককে সেকালের গ্রীক্-ল্যাটিন্ শিখাইয়াছিলেন এবং অ্যাল্কিমি-বিদ্যাতেও দীক্ষিত করিয়া দিয়াছিলেন। প্যারাসেল্সাস্ কিন্তু ক্রমে এই স্বর্ণপ্রদ বিদ্যাকে আর সম্মান করিতেন না। কয়েক-জন খ্রীষ্টান ভক্তের নিকটে তিনি বাইবেল শিখিয়া শেষে তাঁহার পৈতৃক ডাক্তারিব্যবসায় অবলম্বন করেন। তখনই গ্যালেন্, র‍্যাজিস্, অ্যাভিসেনা প্রভৃতি পুরাতন হাতুড়ে কবিরাজদের প্রতি তাঁহার অবজ্ঞা জন্মে। তিনি ডাক্তারীর মূল আয়ত্ত করিতে চাহিয়াছিলেন—কেবল এখানে-সেখানে দুচারিটি হাতুড়ে ঔষধ আবিষ্কার করিয়া তৃপ্ত ছিলেন না। তাই তিনি ভ্রমণে বাহির হইলেন;—রুষিয়ার জঙ্গলে, তাতার নোমাডদের মধ্যে,—নানা স্থানে নানা লোকের সঙ্গে মিশিয়া শিখিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন, "চাকরবাকর,

ছোটলোক-বড়লোক, ওঝা, বুড়া স্ত্রীলোক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিয়া আমি জ্ঞানসঞ্চয় করিয়াছি।” শরীরে-মনে, কাজে-কর্ত্তব্যে, আশায় ভয়ে জড়াইয়া যে মানুষ, প্যারাসেল্‌সাস্ তাহারি মূল অবধি জানিয়া স্বাভাবিক উপায়ে চিকিৎসা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। আমাদের দেশের চিকিৎসকগণ ইহার অর্থ কতদূর বুঝিবেন জানি না। আধুনিক ইউরোপীয় ডাক্তারই বা কয়জনে বুঝেন! পরম-শ্রদ্ধেয় ভক্তিপাত্র একজন অধ্যাপক সেদিন প্যারাসেল্‌সাসের কথায় বলিতেছিলেন, “বাস্তবিক আজকাল ডাক্তারীর এই একটা সমস্যা! এরূপ খণ্ডভাবে ডাক্তারীকে লইলে,— সমস্ত জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া না লইলে, কেবল ‘ভিভিসেক্‌সন্’— জীবন্ত শরীরের ব্যবচ্ছেদ দ্বারা অগ্রসর হইতে চাহিলে ডাক্তারী কোনদিনও উন্নতিলাভ করিবে কি না, কে জানে!” ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, প্যারাসেল্‌সাসের মহত্ত্ব কোথায়! বাস্তবিক সমগ্র জীবনের দিকে দৃষ্টি অনেক লোকেরই নাই। প্যারাসেল্‌সাসের তাহা ছিল। তিনি মানব জীবনের মূল জানিয়া সমূলে রোগ উৎপাটিত করিবার ইচ্ছা করিয়া অশ্রান্ত উদ্যমে দেশবিদেশ ঘুরিয়া আসিলেন; কিন্তু আশানুরূপ ফল হইল না, কতকগুলি ঔষধ আবিষ্কার করিলেন মাত্র, শরীরও অনেকটা ভাঙ্গিয়া পড়িল। ‘ব্যালে’তে আসিয়া তিনি ডাক্তারীর অধ্যাপক হইলেন। স্বয়ং প্রকৃতির কাছ হইতে শেখা ঔষধগুলির শক্তিতে লোকে প্রথমটা চমৎকৃত হইল, প্যারাসেল্‌সাস্ কিন্তু ঔষধআবিষ্কারকে বড়-একটা-কিছু মনে করিতেন না—ছাত্রদের মনে তত্ত্বান্বেষণস্পৃহা উদ্রিক্ত করিবারই সমধিক চেষ্টা পাইতেন।

একদিন কলেজের ভিতরেই 'অ্যাভিসেনা'র একটা গ্রন্থ তিনি পুড়াইয়া দিলেন। লোক সব ক্ষেপিয়া উঠিল, পাকা মাথা সব জড় হইল। প্যারাসেল্‌সাস্‌ 'পুরাণী' কবিরাজদের প্রতি অজস্র বিদ্রূপ প্রয়োগ করিতেন, তাহাতে বুড়া লোকদের অজ্ঞানপঙ্ক মস্তকে ছুঁচ ফুটিত। তিনি 'অ্যাভিসেনা'র ঔষধগুলিকে 'kitchen medicine' বা "রান্না-ঘরের দাওয়াই' বলিয়া অভিহিত করিতেন এবং বলিতেন, "আমি 'পুরাণী' শিক্ষার ধার ধারি না—প্রকৃতির কাছে যাহা আমি নিজে শিখিয়াছি, তাহাই আমরা অবলম্বন—প্রকৃতিই গ্রন্থ, ডাক্তার তাহার ব্যাখ্যাতা।" ক্রমে তাঁহার প্রতি কটূক্তিপূর্ণ ল্যাটিন্‌ কবিতা প্রতি পবিত্র চার্চ্চের দরজায় ঝুলিতে আরম্ভ করিল। প্যারাসেল্‌সাস্‌ অসহিষ্ণু ছিলেন,—তিনি মর্ম্মাহত ও ক্রুদ্ধ হইয়া এ কথা 'ব্যালে'র ম্যাজিষ্ট্রেট্‌দিগকে জানাইলেন। তাহাতেও আবার বিদ্রূপ করিয়া তাঁহাদিগকে "প্রবল, মহান্‌, দৃঢ়, সম্মানিত, বিচক্ষণ, জ্ঞানী, সুশিক্ষিত, সদাশয় মহাশয়গণ"—এইরূপ সম্বোধন করিলেন। পবিত্র চার্চ্চের একজন পিতা প্যারাসেল্‌সাসের চিকিৎসায় রোগমুক্ত হইয়া টাকা দিতে চান না। ডাক্তার ম্যাজিষ্ট্রেট্‌দের নিকট অনুযোগ জানাইলেন, তাঁহারা কিন্তু পবিত্র চার্চ্চের বিরুদ্ধে হাত তুলিতে সাহস করিলেন না; বরং প্যারাসেল্‌সাসের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপরেই হাত পড়িবার উদ্যোগ হইল। প্যারাসেল্‌সাস্‌ তখন পলায়ন করিয়া কল্‌মারে গিয়া আশ্রয় লইলেন এবং সেখান হইতে ভিলাচে ও ভিলাচ্‌ হইতে ব্যাভেরিয়ার ডিউকের আহ্বানে তাঁহার সভায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু পরিশেষে কি কারণে ভাড়া-করা খুনীর হস্তে তাঁহার জীবনলীলার অবসান হয়।

প্যারাসেল্‌সাস্‌ ৪৭ বৎসরমাত্র জীবিত ছিলেন। তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি তিনি বন্ধুদের ও গরীবদের উইল করিয়া বিলাইয়া গিয়াছিলেন।

মালাবারী সম্পাদিত 'প্রাচী ও প্রতীচী' নামক মাসিকপত্র হইতে কুমারী আনা, এম্‌. ষ্টডার্টের লিখিত প্যারাসেল্‌সাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে উপরে সারোদ্ধার ও স্থানে স্থানে অনুবাদ করিয়া লইয়াছি— এখন তাঁহার দুটি কথা তুলিয়া প্যারাসেল্‌সাসের ইতিহাস ক্ষান্ত করি।

ষ্টডার্ট বলিতেছেন—

The nature of this great man was volcanic......... God needed a volcanic nature to reform science just as He needed superlative courage to reform the Church. Paracelsus was to the one what Luther was to the other and by his friends was called "the other Luther."

প্যারাসেল্‌সাস্‌ লুথরের সমসাময়িক ছিলেন। ষ্টডার্টের প্রবন্ধের উপসংহারে আছে—

The man belonged to the whole world as much as did Socrates, Marcus Aurelius, Saint Francis in the West, as Buddha, Ramananda, Chaitanya in the East and it is time that West and East awoke to recognise his claim upon their gratitude.—

কথাটা যদিও বিচার্য্য, তবু এটি নিশ্চয় যে, প্রাচী যদি জাগিত, তাহার তৃষ্ণা যদি বলবতী হইত, আত্মপুষ্টির জন্য নানা দিগ্‌দেশ

হইতে জীবনের রস আহরণ করা যদি তাহার অনিবার্য্য হইত, তবে হয়ত এখানেও আজ প্যারাসেল্‌সাসের ডাক পড়িত, তাঁহার Para-granum ভারতের ভাষায় অনূদিত হইত—কিন্তু তাহা কোথায়? যাই হোক্, ইতিমধ্যে আমরা রবার্ট ব্রাউনিংএর হস্তে নিত্য-মানবলোকে উত্তোলিত প্যারাসেল্‌সাসের সার জীবন দেখিয়া একটি জীবনপূর্ণ শোণিতোষ্ণ কবিত্বের আস্বাদন করিয়া লই।

প্যারাসেল্‌সাস্ কাব্যখানি ৫ খণ্ডে বিভক্ত। প্রতি খণ্ডের উপরে একটি করিয়া নাম আছে।—

(১) "প্যারাসেল্‌সাসের আশার উদ্যম", (২) "প্যারাসেল্‌সাস্ পাইলেন", (৩) "প্যারাসেল্‌সাস্", (৪) "পুনরায় প্যারাসেল্‌সাসের আশার উদ্যম" এবং (৫) "প্যারাসেল্‌সাস্ পাইলেন"—ক্রমান্বয়ে এইরূপ পাঁচটি নামে খণ্ডগুলি চিহ্নিত।

প্রথম খণ্ডে প্যারাসেল্‌সাস তাঁহার বিরাট উদ্দেশ্য হৃদয়ে লইয়া অমিত উদ্যমে অনন্ত রহস্যময় বিশ্বসংসারের দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছেন। তাঁহার বন্ধু ফেষ্টাস্ ও তৎপত্নী মাইকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় প্রথম খণ্ডে একদিকে প্যারাসেল্‌সাসের সেই অমিত উদ্যম, মনো-রহস্যবিষয়ে তাঁহার গূঢ় দর্শন এবং প্রবল অনুসন্ধিৎসা—আর একদিকে সেই সহৃদয় সুন্দর বন্ধুদম্পতির শান্ত জীবনপ্রবাহ সম্যক্ ব্যক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে প্যারাসেল্‌সাস্ হতোদ্যম, ভগ্নহৃদয়,—কিন্তু প্রেমসার বা সৌন্দর্য্যসার ইটালীয় কবি অ্যাপ্রিলে'র সাক্ষাৎলাভে মানুষের ভাবরাজ্যে লব্ধদৃষ্টি। তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে প্যারা-সেল্‌সাস্ আপনাকে সহজেই পাইতেছেন,—মানুষকে যে সব

অজ্ঞানের ভূতে পাইয়া জীবনের একদেশে বসাইয়া রাখে এবং সেই একদেশের অন্ধকারেই তাহার হাড় ভাঙ্গিয়া জীবন অসম্পূর্ণ করিয়া দেয়—সেই সব ভূত প্যারাসেল্‌সাস্‌কে একেবারে ছাড়িয়া গেল, তিনি—

"Man's true purpose, path, and fate"

জানিতে পারিলেন—মৃত্যুর অন্ধকার সত্ত্বেও আশার আনন্দগানে তাঁহার কণ্ঠ প্লাবিত হইয়া উঠিল।

ফেষ্টাস্‌ এবং মাইকল্‌ অন্নের মধ্যে সম্পূর্ণতার চিত্র। সুখে, দুঃখে, বিশ্বাসে, ভালবাসায়, কাজে একটি ছোট জীবন কেমন করিয়া মধুর-গম্ভীর-ভাবে বহিয়া যায়, প্যারাসেল্‌সাসের ঝটিকাক্ষুব্ধ জীবনের পার্শ্বে, ফেষ্টাস্‌ এবং মাইকল, তাহাই দেখাইয়া দিতেছেন। কবি অ্যাপ্রিলে একটি সম্পূর্ণ মানবজীবন হইতে ভাঙিয়া-লওয়া ভাবাংশ বই আর কিছুই নহে। সৌন্দর্য্য ও ভাব মানুষের মধ্যে কতদূর প্রসারিত হয় এবং কিরূপে বিধ্বস্ত হইয়া যায়, অ্যাপ্রিলে তাহারই চিত্র।

পাঠকপাঠিকা ধৈর্য্য ধরিয়া আগেই এই চরিত্রগুলির বিবরণ শুনিয়া লইলে, সবিস্তারে কাব্যখানির আলোচনাকালে সুবিধা হইবে এবং এই সংক্ষেপ বিবরণও সেই বিস্তারের উল্লেখ মিলাইয়া অবশেষে চরিত্রগুলির ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ বেশ মোটামুটি এক রকম দাঁড়াইয়া যাইবে।

এখন বিস্তারে আলোচনায় অগ্রসর হইব। প্রথম খণ্ডে—

ওয়ার্জবার্গের একটি উদ্যানবেষ্টিত গৃহে বসিয়া ফেষ্টাস্, মাইকল্ এবং প্যারাসেলসাস্ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। প্যারাসেল্‌সাস্ বিদায়

লইতেছেন,—তিনি পৃথিবীভ্রমণে যাইবেন। অতি সুজন, সহৃদয় বন্ধু ফেষ্টাস্ এবং তাঁহার সহচরী মাইকল্—দুজনেই শঙ্কিতচিত্তে তাঁহাদের বন্ধুকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছেন। সময় সন্ধ্যা। সেই যে রাজ্যখানি—

This kingdom, limited
Alone by one old populous green wall,
Tenanted by the ever-busy flies,
Grey crickets, and shy lizards, and quick spiders,

হেথা এই রাজ্য ঘের যার চারিধারে
একখানি জীবপূর্ণ সবুজ প্রাচীর !—
চিরব্যস্ত মক্ষিকুল, ঝিঁঝি, গিরগিটি
নিত্য পলায়নপর, মাকড়সা আর
ক্ষিপ্র সুনিপুণ—যত প্রজা হেথাকার !—

এই রাজ্যখানির সহিত সুসম্মিলিত-জীবন ফেষ্টাস্ দম্পতি কিছুতেই তাঁহাদের বন্ধুর আশার উদ্যমকে আয়ত্ত করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা কিছুতেই তাঁহার উন্মত্তদৃষ্টির বিরামস্থল দৃষ্টিপথে খুঁজিয়া পাইতেছেন না। তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাতে এক একটি করিয়া ধ্রুবতারা কি দৃষ্টিসীমায় জ্বলিতেছে?—প্রথমেই ফেষ্টাস্ বুঝিলেন,—প্যারাসেল্সাস্কে ফিরান যাইবে না—তবু প্রীতি ও বিরামের দোহাই দিয়া বুঝাইলেন, ইহাদের মূল্য কম নয়—এইরূপে—

A solitary briar the bank puts forth
To save our swan's nest floating out to the sea.

তীর চাহে একখানি লতাবাহু দিয়া
রাখিতে সাগর হ'তে সারসের নীড় —

তখন প্যারাসেল্‌সাস্‌ তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্যের কথা পাড়িলেন— তিনি ত শৈশবে কিছু বুঝিতেন না—এই বন্ধুর অন্তর্দৃষ্টি ও উৎসাহের গুণেই ত তাঁহার আপনার শক্তি আপনার কাছে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে, এখন কি বলিয়া সেই বন্ধুই তাঁহাকে ফিরাইতে চান। আমরা ঈশ্বরের পথে থাকিতে চাই, তাহার প্রমাণ বুঝি এই যে, এমন ভাবে চলি, যাহাতে জগৎ নিরীশ্বর বলিয়া মনে হয়! এই যে বিরাট আশা, এই যে ঈশ্বরের দান, ইহাকে কি তবে মিথ্যা বলিয়া জানিতে হইবে?—তা ফেষ্টাস্‌ তাঁহার নিজের প্রদর্শিত পথ ছাড়িয়া দিউন; আমি যাহা প্রাণে ধ্রুব বলিয়া জানিয়াছি, তাহা কিছুতেই ছাড়িব না। ফেষ্টাস্‌ তখন শৈশব হইতে প্যারাসেল্‌সাসের জীবনের কথা বিবৃত করিতে লাগিলেন—কেমন করিয়া গ্রামের বিরাম বিশ্রাম হইতে দুই বন্ধু বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলেন— সকল ছাত্রের অপেক্ষা প্যারাসেল্‌সাস্‌ বুদ্ধিমত্তা দেখাইলেন, কিন্তু অচিরেই আবার অধ্যয়নে শৈথিল্য দেখাইতে লাগিলেন। শৈথিল্য আর কিছুই নহে, ঐ অল্প বয়সেই প্যারাসেল্‌সাস্‌ হৃদয়ের ভিতর এক মহাবিদ্যার আভাস পাইয়াছিলেন। বাস্তবিক অন্যান্য ছাত্রেরা যখন তাহাদের ক্ষুদ্র বিদ্যালাভ লইয়া আস্ফালন করিতেছিল, প্যারাসেল্‌সাস্‌ তখন একটা সমগ্র জ্ঞানের কথা ভাবিতেছিলেন। ফেষ্টাস্‌ সকলই জানেন, সকলই বুঝেন,—প্যারাসেল্‌সাসের অসাধারণত্ব তাঁহার অজ্ঞাত নহে, তিনি জানেন যে, তাঁহার মন—

—The secret of the world,
Of man, and man's true purpose, path, and fate :

জগতের মূল, আর মানবের মূল,
অর্থ তার, পন্থা তার, অদৃষ্ট তাহার—

জানিতে চাহিতেছে !—জানেন যে, ঈশ্বরের আহ্বানে তিনি উত্থোথিত হইয়াছেন, মানুষের প্রীতি-নিন্দার সহিত তাঁহার সম্পর্ক নাই—কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, ঈশ্বর যেমন ডাকিতেছেন, তিনি কি তেমনি পথও বলিয়া দিতেছেন ? বাস্তবিক প্যারাসেল্‌সাস্‌ তাঁহার একটা ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা, একটা গভীর আশাতেই পাগল হইয়াছেন, প্রকৃত উদ্দেশ্য নিভিয়া গিয়া প্যারাসেল্‌সাসের আশাই জ্বলিয়া উঠিয়াছে—তাহা না হইলে পাহাড়ে, বনে, সাগরে, অসভ্য বর্ব্বরের মধ্যে যাইবার কি প্রয়োজন ?—এখানে বসিয়াও ত জ্ঞানলাভ করা যাইতে পারিত, কত লোক ত তা' করিয়াও গিয়াছে ! তাহাদের অসম্পূর্ণ কার্য্য লইয়া প্যারাসেল্‌সাস্‌ কেন তাহাদের পথেই যান না !—

What books are in the desert ? writes the sea
The secrets of her yearning in vast caves ?

মরুভূমে কোন্‌ গ্রন্থ আছে ? অম্বুনিধি
আক্রন্দরহস্য তার লেখে কি গুহায় ?

মানুষের মধ্যে, মানুষের সুখ-দুঃখ-প্রীতির মধ্যে, মানুষের ভুলভ্রান্তির উপর আলো জ্বালাইয়া এখানেই প্যারাসেল্‌সাস্‌ বাস করুন, এখানেই জ্ঞানলাভ হইতে পারিবে।

প্যারাসেল্‌সাস্‌ বলিলেন—"না, অনেক অবিশ্বাস, অনেক সন্দেহ,

অনেক যন্ত্রণাপীড়নের পর ধ্রুবসত্য আমার প্রাণে প্রতিভাত হইয়াছে—ইহাকে কখনই ভুল বলিয়া ত্যাগ করা যায় না। বিপথে যাইতে কি ভয়? মানুষের দুর্ব্বলতা আছে বলিয়াই ত আরও দৃঢ়সঙ্কল্পের সহিত স্বকার্য্যে নিযুক্ত হওয়া তাহার উচিত। মানুষের প্রীতিনিন্দাপ্রশংসার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই—আমার নৌকা কখনো সোণা এবং বানর দুয়েরই আহরণে যাইবে না—আমি পৃথিবীর পথরেখাহীন অরণ্যপ্রান্তরে উড়িয়া যাইব। বিহঙ্গ যেমন পথচিহ্নহীন আকাশে পথ দেখিতে পায়, আমিও তেমনি আমার পথ দেখিতে পাইতেছি। 'পুরাণী' জ্ঞানীদের অবহেলা করিতে কি দোষ? অনেকদিন পৃথিবী ত পুরাণ পথে গিয়াছে—কই তাহার বন্ধনরজ্জুর একগাছিও ত ছিঁড়ে নাই?—এখন সময় হইয়াছে, নূতন আলো আসুক!—আর, সত্য কাহারও কাছ হইতে শিখিবার জো নাই, সত্য নিজের মধ্যে—

সত্যজ্যোতি অন্তরমাঝারে—নাহি আসে
বাহিরের কোনো-কিছু হ'তে সত্য-আলো!
সবাকার মাঝে আছে কেন্দ্র সঙ্গোপন,
যেথা সত্য বিভাসিত পরিপূর্ণরূপে—
তারে ঘেরি চারিধারে, প্রাচীরের পর
প্রাচীরের মত, মাংসপিণ্ড মূঢ়-জড়
পূর্ণজ্ঞানে রেখেছে ঘিরিয়া চিরদিন!
বিক্ষেপী বিঘাতী এই মূঢ়-জড় জাল
অন্ধ করি তারে, সব করে ভ্রান্তিময়।
'জানা' শুধু এই বদ্ধ অন্তর্জ্যোতিরেখা

বাহির করিয়া আনা পথ মুক্ত করি'—
প্রবেশ করানো নহে বাহিরের আলো।

আর জগতে বর্ব্বরে-বিজ্ঞেই বা তফাৎ কি? একপরদা বেশী আবরণে বর্ব্বর, একপরদা বেশী উন্মোচনে অবর্ব্বর! কত অদ্ভুত রূপে এই অন্তর্জ্যোতির বিকাশ হয়—তাহার নিয়ম কে জানে! হয়ত সুস্থ অবস্থায় একজন মূর্খ, কিন্তু উন্মাদগ্রস্ত হইতেই তাহার অন্তরের জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইল—তাহার প্রলাপবাক্য হইতে তাহার অন্তরসঞ্চিত মহত্ত্বের পরিচয় পাইলে। সেই বিচিত্রক্রিয়াময় মানুষের মূল একবার জানিব, তাহার মহত্ত্ব একবার অনুমান করিব। হে ঈশ্বর, আর দানবের সৃষ্টি করিও না, মানবজাতিটাকে একবার তুলিয়া দাও। মানুষ হইতে তফাৎ করিয়া আমি কোন গান্ধর্ব্বজগতের কল্পনা করিতেছি না। সেরূপ অনেকে করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমি মানুষকেই রাজমুকুট পরাইব।"

"তাই বলিয়া আমাকে এখানকার এই ক্ষুদ্র প্রেমপ্রীতিতে বদ্ধ হইয়া থাকিতে বলিও না। মূলজ্ঞান লাভ হইয়া গেলে,—আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া গেলে, তখন প্রীতিপ্রেম প্রবল হইবার অবসর পাইবে—ওই যে সেন্‌নদী ছুটিয়া চলিয়াছে, উহার তলদেশে যেমন নানা খনিজ নুড়ী গোপনে চলিয়াছে, আমারও এই উদ্দেশ্যের নিম্নে সঙ্গোপনে তেমনি প্রীতিপ্রেমসুখ আজ সুপ্ত রহিয়াছে।"

এইখানেই ত মারীর বীজ!—এই যে প্রীতিপ্রেমের অনুশীলন অবহেলা করিয়া জ্ঞান অন্বেষণ করিতে যাওয়া, এইখানেই প্যারাসেলসাসের বিনাশবীজ নিহিত আছে। তবু প্যারাসেল্‌সাস্ যে মানুষ,

প্রীতিপ্রেমের তাঁহারও যে প্রয়োজন, মানুষের অনুমোদন যে তাঁহার উৎসাহেও জোর দেয়—তাহা দেখাই যাইতেছে। ফেষ্টাস্‌কে যুক্তি-তর্কে স্বমতে আনিয়া বিদায়কালে অবশেষে প্যারাসেল্‌সাস্ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"তোমার কি মনে হয় আমার সিদ্ধিলাভ হইবে ?"—ফেষ্টাস্ নিজের শক্তি জানেন, এবং প্রেম-বলে আনন্দে জাগিয়া প্যারাসেল্‌সাসের আশার উচ্চচূড়াও দেখিয়া লইতে সমর্থ, তাই তিনি বলিতেছেন, "হাঁ, নিশ্চয় মনে করি।"—তখন প্যারাসেল্‌সাস্ আনন্দস্বরে বলিয়া উঠিলেন—

"ফেষ্টাস্, ডুবুরীর সাহসিক অধ্যবসায়ে কি দুইটি মুহূর্ত্ত নাই? একটি—যখন দারিদ্র্যে সে ডুব দিতে যায়, আর-একটি—যখন সে রাজপুত্রের মত মুক্তা লইয়া উঠিয়া পড়ে ?" এইরূপ একটি বিরাট্ আশার আনন্দেই প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

নয়-বছর পরে দ্বিতীয় অঙ্কে দেখিতে পাই, কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে প্যারাসেল্‌সাস এক গ্রীসীয় দৈবজ্ঞের ভবনে উপস্থিত। কোথায় সেই জলন্ত ললাট! কোথায় সেই বিদ্যুৎপূর্ণ চক্ষু! কুহেলীবাষ্পের আড়ালে পশ্চিমে সূর্য্য ডুবিয়া যাইতেছে, দূরে নগরের হর্ম্ম্যচূড়াগুলি কালো হইয়া আসিতেছে—প্যারাসেল্‌সাস্ দাঁড়াইয়া অদৃষ্টগণনা করিতেছেন—অতীতের পর্য্যালোচনা করিতেছেন। এই নয় বৎসরের অস্থিচূর্ণকারী পরিশ্রমের ফল কি হইল ?—মানবজীবনের মূল আরম্ভেও যাহা জানা ছিল, আজো তাই। এতদিনের পরিশ্রমে প্যারাসেল্‌সাস্ কয়েকটি ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন মাত্র! সেই গূঢ়দর্শী চক্ষুষ্মত্তার এই কি পরিণাম!—আজ প্যারাসেল্‌সাস্ দৈবজ্ঞের

কাছে আপনার অদৃষ্ট জানিতে আসিয়াছেন। দৈবজ্ঞ অদৃষ্টজ্ঞান-প্রার্থী কতগুলি লোককে তাহাদের পূর্ব্বজীবনের সমস্ত সাধনা ও সিদ্ধির বিবরণ লিখিয়া দিতে বলিয়াছে—সে তাহা হইতে তাহাদের ভবিষ্যৎ বলিয়া দিবে। আজ সেই মূঢ় লোকগুলির লেখার পার্শ্বে প্যারাসেল্‌সাসের লেখাও দেখা যাইতেছে। প্যারাসেল্‌সাস্ আজ বুঝিয়াছেন, "সময় বহিয়া যায়" এ কথার অর্থ কি? জীবন সম্বন্ধে প্যারাসেল্‌সাস্ কি লিখিয়াছেন? পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখা গেল, লেখা রহিয়াছে—"সময় বহিয়া যায়, যৌবন চলিয়া যায়, জীবন স্বপ্নমাত্র—কালের এই অবিরাম ধ্বনি। যত লোক জন্মিয়াছে, সবাই এ কথা শুনিয়াছে এবং বলিয়াছে। তবু, ঋতুর পর ঋতু আসে-যায়, মানুষ হাসিয়া খেলিয়া সময় কাটায়—হঠাৎ একটা মুহূর্ত্ত আসে, যখন চকিতে কথাটার অর্থ পরিষ্কার হইয়া যায়—এবং সেই মুহূর্ত্ত হইতে চিরকাল তাহার কুঞ্চিত ললাট, তাহার নিষ্প্রভ চক্ষু বলিয়া দিতে থাকে যে, এ প্রবাদবাক্যটির অর্থ সত্যসত্যই সে বুঝিয়াছে।"—এইরূপে প্যারাসেল্‌সাস্ তাঁহার সাধনা ও সিদ্ধির মোট শিক্ষাটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে একটা পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। কি বাকী আছে, তাহাই তিনি একবার জানিতে চান। এত পরিশ্রম—তাহাও প্রায় বৃথা হইল—ইহার পর তাঁহার চিত্ত আজ বিরাম চাহে। "শ্রান্ত এ জীবনে মোর আসুক নিশীথকাল" বলিয়া চিত্ত ক্রন্দন করিতেছে—

"Rest!
...............this throbbing brow
To cease—this beating heart to cease—
its crowd

Of gnawing thoughts to cease !"—

"বিরাম ! বিরাম পেতাম, যদি
এ ব্যথিত ললাটের থামিত কম্পন !
থামিত হৃদয়ঘাত !—থেমে যেত যদি
হৃন্মর্ম্মদংশনকারী চিন্তারাশি মোর !"

"আর একবার বাঁচিতে চাই ! আর এ আশাভয়ের আন্দোলনে ঘূর্ণ্যমান হইয়া থাকিতে পারি না। সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশিয়া সাধারণ হইয়া যাই ! কেন এ পতন ? কেন কিছু হইল না ? যাক, আমার কাজ ত আমি করিয়াছি। আমি ত জ্ঞানের পথে নিরন্তর চলিতে আলস্য করি নাই। এই সামান্য হৃদয়বেদনা আজ আমাকে পরাভূত করিবে কি ? যে জন পৃথিবীর গুপ্তমন্দিরে জ্যোতির্ম্ময়ী প্রতিমার জ্যোতি চক্ষে রাখিয়া সমস্ত প্রাসাদ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, সে কি অবশেষে ভূতের আরক্ত চক্ষু দেখিয়া ভয়ে ঘুরিয়া পড়িবে ? কখনো নয় ! এই দেখ, অন্ধকার-মন্দিরদ্বারে সে তাহার মস্তকাবরণ উন্মোচন করিয়া মাথা পাতিয়া দাঁড়াইয়াছে—সে যদি জয়লাভ করিয়া পৌরোহিত্যে বৃত হয়, ভাল—না হয়, সে দেবরোষে দগ্ধ, ভস্মীভূত হইয়া যাউক—সে-ও ভাল। সফলতা-বিফলতা আমার কি করিবে ? আমি ত সেই এক প্রেরণার দ্বারা হৃদয়ের আর সব বাসনাকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছি—জীবনের আর-সব সুখ জ্ঞানের জন্য বিসর্জ্জন করিয়াছি ! এ জীবনেও একদিন ত প্রেম ছিল ! যাক্, ভালই হইয়াছে। প্রেমপ্রীতির চর্চ্চার দিকে গেলে, হয়ত প্রবৃত্তির কলুষে যৌবন পঙ্কিল হইয়া যাইত ! (প্যারাসেল্‌সাস্ প্রেমকে এইরূপেই

জানিতেন বটে !) যা হোক্, আমার সমস্ত জীবনটা একটা দিনের মত একটা লক্ষ্যের আলোকে দীপ্ত হইয়া রহিয়াছে। জীবন, মৃত্যু, আলো, অন্ধকার, জগতের রূপ-রস গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ, সর্ব্বত্রই আমি জ্ঞানকে খুঁজিয়াছি। একটি ক্ষুদ্র সত্যের আভাসে, আমি বায়ুত্রস্ত-দেবদারুর অন্ধকারে আবৃত গিরিপার্শ্ব হইতে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া, তাহার অনিশ্চিত কম্পিত দীপ্তির অনুসরণে জলস্তুপারের অসীম শূন্যবিস্তারে ধাইয়া গিয়াছি, অবশেষে খনিজের শিরা-উপশিরা-ছড়ানো আকরমধ্যে বহ্নির আবরণে ঢাকা আমার তরল সত্যস্বর্ণের সাক্ষাৎ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি। সমস্ত সৌন্দর্য্য, সমস্ত বিস্ময়, বস্ত্রের মত দুধারে খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে,—আমি ভিতরের পঞ্জরটি, দৃঢ় সত্যের আকারটি দেখিয়া তৃপ্ত হইয়াছি। সুখসৌন্দর্য্যের তীর হইতে আমার এ তরঙ্গাকুল সমুদ্রে কতদূর আসিয়া পড়িলাম ! এ সমুদ্রে লাভ যাই হোক্, ঐ তীরেও ত একটি মধুর সূর্য্য সমুদিত হইয়া আছে—কিন্তু এ সমুদ্রে একি ভীষণতা—কেবল সুগভীর জলতল হইতে একটা ভয়ঙ্কর রশ্মি উপরের দিকে ছুটিয়া উঠিতেছে। Oh, bitter ; very bitter !

যদি আবিষ্কৃত ঔষধখণ্ডগুলির মধ্যেও কোন একটা অলৌকিক ভেষজ পাওয়া যাইত—এক-কৌটা শক্তি, যাহার বলে বৃদ্ধের বলিত চর্ম্মে যৌবনের লাবণ্য সঞ্চার করা যাইত—একটা কৌশল, যাহাতে সোণা তৈয়ার করা যাইত—একটা আকর্ষণ, যাহাতে চন্দ্ররশ্মি সংহত করিয়া শতধার প্রবাল রচনা করা যাইত !—কেবল আজ তাহা সক্রোধে দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রবলভাবে আমার পবিত্র জ্ঞানান্বেষণস্পৃহা প্রতিপন্ন করিতাম। যাক্, গিয়াছে যাক্ ! প্রাণ কেন শান্ত হয় না

যে, যদি আমার চেষ্টা বিফল হইল ত আর একজনের চেষ্টা সফল হইবে—মানবজাতির উন্নতি হইলেই হইল।"

কিন্তু প্যারাসেলসাস্ আপনাকে অতটা ত্যাগ করিতে শিখেন নাই—অতটা আশা ও নির্ভর তাঁহার অভ্যস্ত নহে—তাই কথাটা মনে আসিবামাত্র প্রাণের মধ্যে এমন একটা ক্রোধ হুঙ্কার দিয়া উঠিল যে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসাধ্য—কেবল কয়েকটা তিক্ত কথায় প্যারাসেল্সাস্ তাহা চাপিয়া রাখিতে চাহিলেন—

O God, the despicable heart of us!
Shut out this hideous mockery from my heart!

হা ঈশ্বর! কি ঘৃণিত মানবহৃদয়!
এ কুৎসিত পরিহাস ঢাক হৃদি হ'তে!

এই-ই বটে প্যারাসেল্সাসের হৃদয়!—

অতঃপর "অরিওল" তীব্রভাবে অনুতাপ করিতেছেন যে, সমগ্র জ্ঞান তাঁহার লক্ষ্য হইয়াছিল। তার ফল ত একেবারে জয় বা একেবারে সর্ব্বনাশ! সাধারণভাবে থাকিয়া দুটা-চারটে ঔষধের অনুসন্ধানে ফিরিলে, তাহাও পাওয়া যাইত—পাওয়া যাক্ আর না যাক্, অনেকটা শক্তি সামর্থ্য-স্বাস্থ্য অবশিষ্ট থাকিতই—কিন্তু অত-বড় উদ্দেশ্য বলিয়া প্রাণপণে যৌবনের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া লাভ ত হইল এই ক'টি ঔষধ, অথচ তাহাদের ব্যবহারে লাগাইবার মত শক্তিটুকুও আজ অবশিষ্ট নাই।

"যা হোক"—প্যারাসেল্সাস্ আত্মপ্রবোধ করিতেছেন—"যা হোক, তবু সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিয়া একটা আলোকের অপেক্ষায় থাকা

একটা কাজ বটে। কিন্তু আলো কোথায়? তবে কি ভুল হইয়াছিল? আমি যখন যুবা ছিলাম, তখন স্বপ্নরাজ্যচারিণী কে একজন আমার কাছে নিঃশব্দে যাতায়াত করিত—হৃদয় ভীত, ব্যথিত হইলে তাহার কোমল উরুমূলে আমার মাথা তুলিয়া লইত—তাহার সেই সিক্তকেশের স্পর্শ, তাহার সুচতুর আশ্বাসবাণী সকলই কি তবে মিথ্যা! তাহার প্রেরণায় স্বপ্ন দূর করিয়া দিয়া আমি কি মরণকে আহ্বান করিলাম! একি ভ্রান্তি! একি সন্দেহ! একি অবিশ্বাস! তবে কি মতিচ্ছন্ন হইলাম! হে ঈশ্বর, তুমি চিন্ময়, আমার চিৎকে অন্তত রক্ষা কর—আমাকে উন্মত্ত, উদ্‌ভ্রান্ত হইতে দিও না—আমার সব বিফল হোক্, তবু যেন ধ্রুবই জানিতে পারি—তোমারি আহ্বান শুনিয়া, তোমারি কার্য্যে ছুটিয়া গিয়াছিলাম। আর কিছু চাই না, নূতন কিছুই চাই না—অন্তত একঘণ্টার জন্য আমার যৌবনের শক্তি ফিরাইয়া দাও, একবার মাথা তুলিয়া দেখিয়া লই এতদিন কি করিলাম,—আবিষ্কৃত সত্যগুলি হইতে যদি একটা-কিছু খাড়া করিয়া তুলিতে পারি।”

“থাক্,—যাক্, তথাপি ঈশ্বর মঙ্গলময়! আমি বটে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছি, কিন্তু কাননে-প্রান্তরে বসন্তরচনা কাহার? যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সংস্কারও করিতে পারেন। আমি অতীতের নিষ্ফলবৎ প্রতীয়মান চেষ্টাগুলির ফলে হয় ত কোন আশ্চর্য্য পুরস্কার লাভ করিব। আমি কি দোষ করিয়াছি,—কেন শাস্তি পাইব?”—তবেই দেখা যাইতেছে, প্যারাসেল্‌সাস্ এখনো তাঁহার অভাব বুঝিতে পারেন নাই। কোন্ মানুষই বা পারিয়াছে? মনুষ্যবুদ্ধির কি ক্ষুদ্রতা, অথচ জগতের কি কঠিন নিয়ম!

যে খণ্ড আলোচিত হইতেছে, সেই দ্বিতীয় খণ্ডের নাম 'প্যারাসেল্‌সাস্ কি পাইলেন।' এইবার দেখিব প্যারাসেল্‌সাস্ কি পাইলেন !

সন্ধ্যায় প্যারাসেল্‌সাস্ যখন উপরোক্তরূপে বিলাপ করিতেছিলেন, তখন সেই ভাবমাত্র মানুষটি আসিয়া উপস্থিত। এই সৌন্দর্য্যসর্ব্বস্ব কবি প্যারাসেল্‌সাসের বিপরীতে একদেশে ছিন্নভিন্ন হইয়া উন্মাদগ্রস্ত। ভগ্নজীবনের গান গাহিতে গাহিতে ইটালীয় কবি অ্যাপ্রিলে আসিয়া উপস্থিত। অ্যাপ্রিলে গানে জানাইতেছেন যে, তিনি ভ্রষ্ট কবিদের গান শুনিতেছেন। এই কবিদিগকে ঈশ্বর শক্তি দিয়া ধরণী উদ্ধার করিতে পাঠাইয়াছিলেন—তাহারা কিছুই করে নাই। এখন তাহারা ছায়াদেহ লইয়া শূন্যে বিচরণ করিতেছে। দেখিতেছে, কোথায় কে নূতন কবি জাগে—তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছে। অ্যাপ্রিলেও ঈশ্বরের দানে ঐশ্বর্য্যান্বিত একজন কবি। প্রকৃতির স্বহস্তসজ্জিত ইটালীতে তাঁহার জন্মভূমি বাছিয়া দেওয়া হইয়াছিল—তাঁহার জন্মকালে ছায়াকবিগণ আশার উৎসবে মাতিয়াছিল। ছায়াকবিগণ অন্ধকারে যাতায়াত করিয়া অ্যাপ্রিলেকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু অন্ধ অ্যাপ্রিলে তাহাদের সঙ্কেত বুঝিতে পারেন নাই। ধরণী তেমনি শৃঙ্খলিতা রহিল !—হা কষ্ট !—

Anguish! ever and for ever;
Still beginning, ending never

অ্যাপ্রিলের জীবনও বিফল হইল। তাই তিনি আজ ভ্রষ্টকবিদের শূন্যচারী ছায়ামণ্ডলীমধ্যে স্থান লইতে আহূত হইতেছেন।

অ্যাপ্রিলে প্যারাসেল্‌সাস্‌কে দেখিয়া ভাবিলেন, এইবার তবে ভাবচর্চ্চার সঙ্গে কর্ম্মপটুত্ব মিলিত হইয়াছে—অ্যাপ্রিলে পাগলের মত গিয়া যেন প্যারাসেল্‌সাসের পদতলে আপনাকে লুটাইয়া দিতে লাগিলেন। ঐ যে অ্যাপ্রিলে সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়াছেন—অস্ত-কালের কনকরশ্মিশলাকাগুলি অ্যাপ্রিলের কনককেশরাশির সহিত মিলিয়া যাইতেছে। ব্যথাপূর্ণ বিফল আপীড়নে বিকৃত ললাট-ভ্রূর নিম্নদেশে থাকিয়াও তাঁহার দুঃখপূর্ণ সুনীল চক্ষুতারকাদুটি মুক্ত-প্রায় হইয়া কোন্‌ মায়ালোকের অভিমুখে উড়িয়া যাইতে চায়। নৈরাশ্যের অনন্ত দীর্ঘশ্বাসে দৃঢ়সংবদ্ধ তাঁহার ওষ্ঠাধর জোর করিয়া কোন্‌ কঠোর কথা শিখাইতে আইসে! প্যারাসেলসাস্‌ যতই কৌতূহলে এই উন্মত্তের দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন, কিছুতেই তাঁহার কথা বুঝিতে পারিতেছেন না। প্যারাসেল্‌সাসের অসঙ্গত প্রশ্ন-প্রতিবাদের পরে অ্যাপ্রিলে তাঁহার ভারাক্রান্ত হৃদয় হইতে একটি সৌন্দর্য্যসার জীবনের বিপুল ইতিহাস এবং কর্ম্মপটুত্বাভাবে তাহার নিষ্ফলতার দুঃখগান বাহির করিয়া দিলেন।—এই কবি পৃথি-বীর সমস্ত পদার্থ হইতে মনের ভিতর একটি সৌন্দর্য্যের ছাপ লইতেন এবং শিল্পে তাহা ব্যক্ত করিতে চাহিতেন। সমস্ত আকার এবং বর্ণের সৌন্দর্য্য আয়ত্ত করিয়া শেষে হর্ষ-ব্যথা-আশা-আকাঙ্ক্ষা-কল্পনার সৌন্দর্য্য ভাষায় ফুটাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। বহুধাসম্বদ্ধ শব্দস্তূপে এইরূপে জীবনের সহজজ্ঞেয় সৌন্দর্য্যকথা জানাইয়া অবশেষে শব্দের ছেদে ছেদে, দুটি তারার মাঝখানকার প্রভাবন্ধনের ন্যায় সঙ্গীতের ইন্দ্রজাল নিশ্বসিয়া দিয়া, অন্তরের গভীর অনুভাব-

রাশি অন্তঃপ্রবাহিত করিয়া দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন! অ্যাপ্রিলে তাঁহার কবিজীবন এইরূপে সম্পূর্ণ করিবার সঙ্কল্প করেন—

Preserving through my course
God full on me, as I was full on men.

সারাপথ জগদীশজ্যোতি প্রাণে ভরি
পূর্ণ হ'য়ে ধরা'পর উদিব সুন্দর।

কিন্তু এত-বড় কাজের উপযুক্ত শক্তি মানবের কোথায়? অ্যাপ্রিলে শীঘ্রই ধরণীমণ্ডলে প্রাপ্য যন্ত্রাদির ক্ষুদ্রতা ও দুর্ব্বলতা দেখিতে পাইলেন। শেলীর মত অ্যাপ্রিলের তরণী এই বাস্তব-রাজ্যের অরণ্যময় অসভ্যের দ্বীপে ঠেকিয়া ভাঙিয়া গেল। এই ক্ষুদ্র সংসারে কেমন করিয়া অ্যাপ্রিলে তাঁহার মানসরাজ্যের অপূর্ব্বপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবেন?—যা হোক্, এ দ্বীপে যাহা পাওয়া যায়, তাহা লইয়াই কাজ করিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই তাল বৃক্ষরাজিই মর্ম্মরস্তম্ভের কাজ করিবে,—এই পক্ষীর পালক, সাপের নির্ম্মোক, মাছের শল্ক—এই সব লইয়াই, যেমন করিয়া হোক, একটি গঠন খাড়া করিতে হইবে। তবে এমনি করিয়া সাজান যাক্, যে, লোক চমৎকৃত হইয়া বলিতে থাকে—"এ এদেশের কারিকর নহে, এ যে নন্দনের কারিকর!" পৃথিবীর হীন সরঞ্জামে বিন্যাসের অপূর্ব্ব চমৎকারিত্ব দেখাইয়া যদি তাহার মধ্যে তাঁহার মনোরাজ্যের কোন লতা-পুষ্পপত্রের সমাবেশ করিতে পারা যায়, তবে তিনি সবাইকে ডাকিয়া বলিবেন—"দেখ দেখ বন্ধুগণ,—কপোতসঙ্কুলিত কত পাহাড়, অপূর্ব্ববৃক্ষাচ্ছাদিত কত রক্তবর্ণ মৃৎস্তূপ, কত চক্ষুপীড়ক ক্ষীরধবল

শুভ্র বালুকারাশির বিস্তার অতিক্রম করিয়া আমি এক চমৎকার চন্দ্রালোকিত প্রান্তরে গিয়া পৌঁছিয়াছিলাম ;—সেথায় অধীর হইয়া আমি এই লতাপত্রমুকুল সংগ্রহ করিয়াছি। আমার কাছে ইহাদের রমণীয়তা অল্প, কারণ ইহাদের মনোরম জন্মস্থানে আমি ইহাদিগকে দেখিয়াছি ; তোমরা লও, ইহা জড়াইয়া মাথায় পর এবং ইহাদের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কল্পনা করিতে থাক—কোন্ নির্ঝরজল ইহাদের অঙ্গে সিঞ্চিত হইয়াছে, কিরূপ তারকা প্রতিরজনীতে ইহাদের শিরে জ্যোতি কম্পিত করিয়াছে, কোন্ সর্পশিশুগণ বহুদূর হইতে আসিয়া ইহাদের অন্তরসঞ্চিত শিশিরজল পান করিয়া পলাইয়া গিয়াছে।”—তার পরে অ্যাপ্রিলে ক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষাকেও যথাসাধ্য ভাষাদান করিবেন ভাবিয়াছিলেন—কিন্তু হা কষ্ট !—এ সব কিছুই হয় নাই। কারণ তাঁহার ভাবরাশিকে তিনি আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। অত্যুজ্জ্বল কল্পনামূর্ত্তিগুলি তাঁহার মনোনেত্র ঝল্‌সাইয়া দিয়াছে। একটি-কোন মূর্ত্তিকে ধরিতে গেলেই অবশিষ্ট-গুলির স্মৃতি কুহেলীবাষ্পের মত আসিয়া তাঁহার চক্ষু অন্ধ করিয়া দেয়—পর্ব্বতপ্রান্তপথে ঝঞ্ঝাহত লোকটির মত তাঁহাকে অজস্রবৃষ্ট করকাজালের ঘূর্ণপ্রবাহ আসিয়া কোথায় ছুটাইয়া লইয়া যায় !—অ্যাপ্রিলে কিছু করিতে পারেন নাই, কিন্তু করিতে যে পারেন নাই, তাহার যথেষ্ট কারণ ছিল না কি ?—এইরূপ ঝঞ্ঝাকে কে আয়ত্ত করিতে পারে ?—এইরূপে কাতরক্রন্দনে বিলাপ করিতে করিতে অ্যাপ্রিলে ঘুরিয়া-ঘুঠিয়া প্যারাসেল্‌সাসের পায়ের উপর পড়িয়া যাইতেছেন। এইবার প্যারাসেল্‌সাস্ স্তম্ভিত হইলেন। হঠাৎ

তাঁহার চক্ষে এক বিশাল জগতের দ্বার উন্মুক্ত হইল। তিনি জগতের মূল জানিতে গিয়া, শক্তির অভিমুখে ছুটিয়া মানবজীবনের শ্যামল ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ কোন্ এক বিপুল প্রান্তরে আদৌ পদার্পণ করেন নাই—তিনি এতদিন কেবল একটা শিলাকঙ্করময় বিদীর্ণ মরুভূমি: প্রেতবৎ কি খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন। আজ তিনি কাতর হইয়া বলিতেছেন—

"We are weak dust. Nay, clasp not, or I faint!"

গভীর রাত্রির অন্ধকার! অন্ধকারে দুইটি ভগ্ন জগৎ পরস্পরের বুকে পড়িয়া এক হইয়া যাইতে চায়! অ্যাপ্রিলে বলিতেছেন- "হাঁ, এখন আমি স্পষ্টই দেখিতেছি—পরমেশ্বরই একমাত্র পরিপূর্ণ কবি। তিনি তাঁহার বিভাবনারাশি বহুবিচিত্র সৃষ্টিতে গড়িয়া তুলিতেছেন। মানুষও ঈশ্বরের সমান হইতে চায়। মানুষের দুর্ব্বলতাতেও গৌরব। কারণ দুর্ব্বলতার মধ্যেও শক্তি আবির্ভূত হইয়া মানুষকে ঈশ্বরসদনে উত্তোলন করে। আর ঈশ্বরের গৌরব তাঁহার অনন্ত শক্তি। এই শক্তিবলেই মানুষের দুর্ব্বলতাকেও তিনি ভালবাসিয়া তাহারি সমান হইয়া অবতীর্ণ হইতে পারেন—হায়, আগে যদি জানিতাম!" অন্ধকার গভীরতর হইল। প্যারাসেল্‌সাসের ভগ্নহৃদয়ে লুটাইয়া পড়িয়া, অ্যাপ্রিলে তাঁহার ব্যর্থ জীবন শেষ করিলেন।

"Give me thy spirit, at least! Let me love too!"

এই বলিয়া প্যারাসেল্‌সাস্ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। আমরাও দেখিয়া লইলাম—প্যারাসেল্‌সাস্ কি পাইলেন।

৩য় ও ৪র্থ, এই দুই খণ্ড ব্যাপিয়া প্যারাসেল্‌সাসের গভীর যন্ত্রণা। প্যারাসেল্‌সাস্ তাঁহার পূর্ব্বজীবনটা ছাড়িতে চাহিতেছেন। তাঁহার বর্ম্মচর্ম্ম দেহ হইতে ছিঁড়িয়া লইতেছেন অথবা কে যেন ভাঙিয়া-চুরিয়া আনিয়া-ছিঁড়িয়া লইতেছে। কীট্‌সের ল্যামিয়া তাহার সর্পরূপ পরিত্যাগ-কালে যেমন বহুক্ষণ ধরিয়া নিপীড়িত হইতেছিল—

Her eyes in torture fixed, and anguish drear,
Hot, glazed, and wide, with lid-lashes all sear,
Flashed phosphor and sharp sparks,
without one cooling tear
The colours all inflamed throughout her train,
She writhed about, convulsed with scarlet pain.

প্যারাসেল্‌সাস্‌ও সেইরূপ তাঁহার পূর্ব্বজীবন ছাড়িবার সময়ে এই দুই খণ্ড ব্যাপিয়া

writhed about, convulsed with scarlet pain

'দেহ রক্তবর্ণ হইয়া উঠে; এমন এক তীব্র বেদনার বিক্ষেপে অঙ্গসঙ্কোচ করিয়া ধূলায় লুণ্ঠিত' হইতেছেন। একটা দুর্জ্জয় কঠোরতা কিরূপে নিস্পেষিত হইয়া কোমলতা প্রাপ্ত হয়, এই দুটি খণ্ডে অপূর্ব্বশক্তিসহকারে তাহা দেখান হইয়াছে।

তৃতীয় খণ্ডে প্যারাসেল্‌সাস্ 'বাসে'র অধ্যাপক। ফেষ্টাস্ লুথরের কাছ হইতে জুইংলিয়াসের কাছে একটা খবর লইয়া চলিয়াছেন, পথে বন্ধুর যশোরশ্মিমণ্ডিত মুখখানি একবার দেখিয়া যাইতেছেন। প্যারাসেল্‌সাস্ প্রথমে ফেষ্টাসের ঘরের কথা পাড়িলেন—

"মাইকল্‌ কেমন আছে? এখনো কি সে একা একা বসিয়া পাখীর মত গান ছাড়িয়া দেয়? একা একা যাহারা গান করিতে পারে, তাহারা সম্মানের পাত্র।''

প্যারাসেল্‌সাস্‌ ত কখন একা বসিয়া কোন-কিছু সম্ভোগ করিতে পারেন না। ভাবই মানুষকে আপনার মধ্যে নিবিড়ভাবে বসাইয়া তৃপ্ত করিয়া রাখিতে পারে। জ্ঞানের মধ্যে একটা উগ্র তৃষ্ণা আছে—একটার পর আর একটা আবিষ্কারের জন্য মন ছুটিতে থাকে,—মোহিত যতই হৌক, ভূতগ্রস্ত যতই হৌক, নিষ্কর্ম্মনিবিড় শান্তি আস্বাদন করিবার সৌভাগ্য তাহার নাই। অশান্তচিত্ত প্যারা-সেল্‌সাস্‌ বারবার সেই শান্তির মধ্যে নামিবার চেষ্টা পাইতেছেন—ফেষ্টাসের সুখশান্তিময় গৃহজীবনের কথা আলোচনা করিতেছেন। কিন্তু ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহার অধ্যাপনার কথাই আসিয়া পড়িতেছে। প্যারাসেল্‌সাস্‌ তিক্তপ্রাণে তাঁহার অবসন্ন শক্তি, ব্যর্থ সাধনার কথা স্মরণ করিতেছেন, তথাপি মন্দকে ভাল করিবার আশায় অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইয়াছেন। এখনও তাঁহার সহানুভূতির উদয় হয় নাই, এখনও মূর্খতা তাঁহার অসহ্য, তবু ছাত্রদের পড়াইতেছেন। তাহাদের মনে সত্যানুসন্ধিৎসা জাগাইতে তৎপর হইয়াছেন, 'পুরাণী'দের অজস্র নিন্দা করিতেছেন,—গ্রন্থ পুড়াইয়া দিতেছেন। দেখিতে পাই, তাঁহার প্রাণ এখনও কাঠিন্যময় রহিয়াছে, তবে মাথায় বুঝিতেছেন মাত্র যে, মানুষের হৃদয়ই মানুষের মুক্তিমূল। প্যারাসেল্‌সাস্‌কে এ কথাটি যুক্তিদ্বারা বুঝিয়া বুঝিয়া তাহার পর হৃদয়ে লইতে হইতেছে—ঠিক হৃদয়ের স্বাভাবিক আন্দোলনে কথাটি বুঝিতে পারিতেছেন

না,—এমনি কঠিন বর্ম্মে তাঁহার মনুষ্যত্ব আবৃত হইয়া গেছে। তিনি মাথায় বুঝিতেছেন মাত্র—

"From God
Down to the lowest spirit ministrant"

ঈশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষীণতম চিন্বান্ পর্য্যন্ত—এই বিপুল চিৎ-সমষ্টির কাছে মানুষের বুদ্ধি কোথায় কোন্ অপরিমেয় অন্ধকারে হারাইয়া যায়; কিন্তু প্রেম-বিশ্বাস ও আশা-ভয়েই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব।

এখন চতুর্থ খণ্ড। এ খণ্ডে এক ভীষণ যন্ত্রণা। ফেষ্টসের৺ চিরপ্রফুল্ল মুখখানিতে আজ দুঃখকালিমা!—তাঁহার মাইকল্ আজ শিকড়জালের মধ্যে শিশিরসিক্তি মৃৎকক্ষে অনন্তনিদ্রায় নিদ্রিত! তথাপি বিশ্বাসে ফেষ্টাসের হৃদয় স্থির হইয়া আছে! কিন্তু প্যারাসেল্-সাস্ 'ব্যালে'তে অপমানিত, পদচ্যুত হইয়া একেবারে দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এতদিন হৃদয়ের এক কোণে যে ব্যবসার প্রতি বিকার উঠিতেছিল, অথচ কি-এক মোহে যাহা ছাড়িতে পারিতেছিলেন না, আজ সেই ব্যবসা হইতে তাঁহাকে জোর করিয়া ছাড়ান হইল। এতদিন প্যারাসেল্সাস্ তাঁহার ব্যর্থপ্রায় জীবনকেও যথাসম্ভব সার্থক করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহার সেই মহা-উদ্দেশ্যের নৌকায় সন্দিগ্ধভাবে মুহূর্মুহু হাল নাড়িতেছিলেন, যদিও বায়ু ও জীবনস্রোত তাঁহাকে অন্যপথ প্রদর্শন করিতেছিল, তথাপি পূর্ব্বপথের অভিমুখেই মুহূর্মুহু হাল নাড়িতেছিলেন—কিন্তু সম্পূর্ণতা নহিলে সার্থকতা কোথায়? পদে পদেই দেখিয়াছি, হৃদয়ের তিক্ততা প্যারাসেল্সাস্কে কিরূপ বিক্ষিপ্ত করিতেছে। কিন্তু আজ জীবন আপনার নিয়মে

আবর্ত্তিত হইয়া চারিদিকে কতগুলি ঘটনা টানিয়া আনিয়া, প্যারা-সেল্‌সাস্‌কে তাঁহার মোহকর তীরের স্পর্শ হইতে ছিঁড়িয়া লইয়া, আপনার সম্পূর্ণতার দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল। এই "তীর সাথে শত ডোর" ছিঁড়িবার কালে প্যারাসেল্‌সাসের কি কষ্ট!—প্যারাসেল্‌-সাস্‌ নিপীড়নে অস্থির। এক-একবার আহ্লাদে ফেষ্টাস্‌কে বলিতে-ছেন বটে—তিনি পদচ্যুত হইয়াছেন, ভালই হইয়াছে এখন আপন পথে যাইবেন; কিন্তু অচিরেই অপমানকারীদের প্রতি তীব্র গালি প্রদান করিতেছেন, কখনো বা বলিতেছেন—"শিখিয়াছি, শিখিয়াছি ভাই, সেই অতি পুরাতন, অতি কার্য্যকারী, 'জোর-করিয়া-শেখান' বিধিটির কঠোর প্রয়োগে এবার শিখিয়াছি, কোন্‌ পথে আমাকে যাইতে হইবে"—আবার যেন রাগত হইয়া বলিতেছেন, "যাই, যাই, সুখচর্চ্চায় যাই, নিতান্ত জড়ময় ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার যেটুকু সুখ, তাহাও ছাড়িব না।" বাস্তবিক সর্ব্বসত্ত্বময় নিপীড়নে প্যারাসেল্‌সাস্‌ আজ অস্থির। তাঁহার দেহ মনের সমস্ত কল-চাকা-স্ক্রু এমনি ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে, তাহাতে জ্ঞানান্বেষণের উপযোগী অভ্রান্ত কর্ম্মই সম্পন্ন হইতে পারে, কেমন করিয়া আজ তিনি সেই যন্ত্রটি চুরমার করিয়া দিয়া তাহার সন্ধিতে সন্ধিতে মৃণাললালিত্য, তাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঙ্গীতের সুর আনয়ন করিবেন? এই নিপীড়নের পাশাপাশি ফেষ্টাসের স্ত্রীবিয়োগরূপ গভীর দুঃখ একটি পরম সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সেই শান্ত বিশ্বাসী লোকটি কেমন সহজেই দুঃখের অন্ধকারে প্রবেশ করিয়া আপনার স্থির আসনখানিতে বসিয়া আছেন। তথাপি প্যারাসেল্‌সাসের গভীর যন্ত্রণার সঙ্গে ফেষ্টাসের

দুঃখ কেমন-একটি ঘাত প্রাপ্ত হইতেছে। অন্যদিন হইলে কেট্‌স্—তাঁহার বন্ধুর যত বড়ই যন্ত্রণা হোক না—অসীম ধৈর্য্যে তাঁহার ক্ষত-স্থান স্পর্শ করিয়া ভালবাসার নানা কোমল প্রলেপে তাঁহাকে শান্ত করিতে যত্নপর হইতেন—আজও যতক্ষণ ধরিয়া তাঁহার অশান্ত আই-ঢাই শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে কেট্‌সের দৃঢ় হৃদয়ের পরিচয় পাই—কিন্তু দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে আর কত পারা যায়!—শেষে যেন কেট্‌স্ একটু তীব্র হইয়া উঠিতেছেন—প্যারাসেল্‌সাসের এত যন্ত্রণা কিসের?—তাঁহার ত যথেষ্ট কাজ হইয়াছে—তাঁহার কীর্ত্তি ত চিরদিন থাকিবে, তিনি ত ঈশ্বরেরই সেনাপতি।—হায়! একমাত্র বন্ধুও আজ প্যারাসেল্‌সাসের যন্ত্রণা বুঝিলেন না। কিন্তু অবশেষে বুঝিলেন—হৃদয়কে একটু প্রসারিত করিয়া বুঝিলেন। প্যারাসেল্‌সাসের প্রবলতা ত চিরদিনই কেট্‌স্‌কে কল্পনা করিয়া—হাত বাড়াইয়া অনুভব করিতে হয়। তবু হাত বাড়াইয়াও তাঁহার মহত্ত্ব অনুভব করিয়া তিনি যে আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠেন, সে কি গভীর! যে দিন প্যারাসেল্‌সাস্ 'ব্যালে'র-অধ্যাপকরূপে আবির্ভূত, সে দিন কেট্‌সকে প্যারাসেল্‌সাস্ তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন—বক্তৃতা শুনা তাঁহার তত উদ্দেশ্য নয়, তিনি শুধু লোকেদের মধ্যে মিশিয়া প্যারাসেল্‌সাসের যশোবার্ত্তা সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন। এই-ই বটে কেট্‌স্—তিনি শুধু হৃদয় পাতিয়া বন্ধুর সম্পর্কিত আনন্দটুকু অনুভব করিয়া কৃতার্থ হন। আজও হৃদয় বাড়াইয়া বন্ধুর দুঃখ তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন—কিন্তু কত সহা যায়! শেষে বলিয়া ফেলিলেন, মাইকল আর নাই। প্যারাসেল্-

সাস্ সেই মৃত্যুর শীতল-শান্ত ক্রোড়ের কথা ভাবিতে লাগিলেন—

And Michal sleeps among the roots and dews,
While I am moved at Basil, and full of schemes
For Nuremberg, and hoping and despairing,
As though it mattered how the farce plays out,
So it be quickly played. Away, away !
Have your will, rabble ! while we fight the prize,
Troop you in safety to the snug back-seats,
And leave a clear arena for the brave
About to perish for your sport !—Behold !

বীর প্যারাসেল্সাস্ মূর্খ সাধারণের জন্য আপনাকে পাত করিতে যাইতেছেন, এখনও তীব্রভাবে সে কথাটা তাঁহার হৃদয়ে জাগিতেছে। কিন্তু এই চতুর্থ খণ্ডটির নাম 'প্যারাসেল্সাসের আশা'। কি তাঁহার আশা, তাহা একবার দেখিতে হইবে।

সত্যসত্যই প্যারাসেল্সাসের আশা জাগিয়াছে। তাহা তাঁহার প্রাণের গভীরতার ভিতরে জাগিয়াছে—প্যারাসেল্সাস্ তাহার আভাস পান আর নাই পান, আমরা তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাই। এ আশা মনের কর্তৃত্বে সচেতন আশা নহে, এ আশার অর্থ পরিপূর্ণতার দিকে জীবনের বিকাশ। প্যারাসেল্সাস্ যে কোমল হইয়া আসিতেছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার হৃদয়ের নীচে, নিভৃতে যে দুটি-একটি ফুল ফুটিতেছে, তাঁহার মনে তাঁহার অজ্ঞাতসারে ভাব-

কোমল কল্পনার এক-একটি ঝুম্‌কা-ফুল যে ফুটনোন্মুখ হইয়া উঠিতেছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার সেই জ্ঞানসার জীবনের দিকে তিনি যে আজ চাহিয়া দেখিতেছেন—সে দৃষ্টিতেও আজ ক্ষণে ক্ষণে একটা অশ্রুবাষ্পাচ্ছন্ন ভাবই সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। গত জীবনের বিদায়সম্ভাষণে তিনি আজ পাগলের ন্যায় মুহুর্মুহু কেবল কল্পনাবিচিত্র গান গাহিয়া উঠিতেছেন;—কঠোর সেই গতজীবনের মধ্যেও কতগুলি সৌন্দর্য্যস্মৃতি তাঁহার চিত্তকে আবিষ্ট করিতেছে—তিনি সেই সৌন্দর্য্যগুলিকে একটা গান গাহিয়া বিদায় দিতেছেন :—

চাল স্তূপে দারুচিনি, চন্দনমুকুল,
অহিফেনসারক্ষীর, নানা গন্ধচূর,
চাল তৈল মোহনময়-সৌরভ-আকুল
যাহে ভারতের নারী ভিজায় চিকুর—
(এ হেন সুরভিমিশ্র ঝরি' ঝরি' পড়ে
সমুদ্রবেলায় গিরিবেদি-পরিসরে
গিরিকূট হ'তে নিত্য,—অনিল যেথায়
গর্জ্জিত-সমুদ্র'পরে বহি' শ্রান্তকায়,—
দ্বীপের দুর্ভাগ্য ধন আহরিতে চায়।)

অতি মৃদু গন্ধাভাসে রেণু যাহ উড়ে
মিসরের কীটদষ্ট গাত্রবাস হ'তে—
যাহারে খুলিতে গেলে, যায় ভেঙে-চুরে,
গন্ধবাষ্প, মেঘসম ছাড়ি' বায়ুস্রোতে—

যেন মেঘ জমেছিল বহুকাল ধ'রে
একখানি বহুকাল নিরজন ঘরে—
চারিধারে যবনিকা জীর্ণ পুরাতন—
ভিতরে চৌদিকে বীণা, গ্রন্থ অগণন,—
যৌবনে মরেছে সেথা রাণী একজন।

তবেই দেখিতে পাই, প্যারাসেল্‌সাসের অশ্রুনীহারে আজ ইন্দ্রধনু বিস্ফুরিত,—যদিও তাঁহার সেই রূঢ় ভাবটি অচিরেই জাগিয়া উঠিয়া তাঁহার এই অচিরবিকশিত কবিত্বকে উপহাস করিতেছে। গানটি হইয়া গেলে, একটা তিক্ত বিদ্রূপে প্যারাসেল্‌সাস্‌ ফেষ্টাস্‌কে বলিতে-ছেন—"দেখ দেখ, গানটায় ঔষধের তালিকা দেখিয়া আমার পুরাণ ব্যবসায় গন্ধ পাইবে—আর ছন্দটা দেখ, মূর্খের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গানের ছন্দের মত ঠেকিয়া ঠেকিয়া যাইতেছে!" আবার নানা কথাবার্ত্তায় অনন্ত যন্ত্রণা ব্যক্ত করিয়া প্যারাসেল্‌সাস্‌ তীব্র-করুণ-স্বরে গাহিয়া উঠিতেছেন,—"আমরা জাহাজমণ্ডলীর উপর সুরঞ্জিত তাঁবু বসাইয়া, রত্ননির্ম্মিত জাহাজগুলি লইয়া, সদর্পে সমুদ্রতরঙ্গ ভাঙিয়া চলিয়াছিলাম—দিনে-রাত্রে, উদয়ে-অস্তে কেবল আশায় গান গাহিতাম। ক্রমে আমাদের পশ্চাতে তরঙ্গায়িত সিন্ধুপ্রসার ভীষণ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিল—কিন্তু সম্মুখে তীর দেখিলাম, তীর ত পাহাড়। বন্দরের প্রতি জাহাজে একটি করিয়া প্রতিমূর্ত্তি তখন সুনির্ম্মিত হইয়াছে। আমরা বন্দরে উঠিলাম। সারাদিন বসিয়া আমরা মন্দির তৈয়ার করিয়া সেই স্বচ্ছ প্রতিমাগুলিকে স্থাপনা করিতে অগ্রসর হইলাম। কিন্তু ছোট ছোট নৌকায় চড়িয়া কতকগুলি দ্বীপবাসী লোক

তিড়াইয়া বলিল—ঐ দেখ, সন্ধ্যায় দীপগুলি মেঘের মত দেখাইতেছে, ওখানে জলপাই-কুঞ্জের ছায়ায় এ প্রতিমাগুলিকে বসাইব, প্রতিমা-গুলি দাও' —(হায় এই রকম করিয়াই প্যারাসেল্‌সাসের এত সাধনের ধনগুলি সাধারণ লোকেরা সাধারণ কাজে লাগাইতে চায়!)— প্রতিমা চাহিতেই আমরা যেন স্বপ্নোত্থিত হইলাম—এ কোন্ মরু-পাহাড়ে আসিয়া পড়িয়াছি। যা হোক্, গর্জ্জিয়া বলিলাম—"দূর হও, যদিও আমাদের সর্ব্বপ্রযত্ন বিফল হোক্, তবু আমাদের প্রতিমাগুলি তোমাদের মত অসভ্যের হাতে দিব না—দূর হও।"—প্যারাসেল্‌সাস্ কাহার জন্য ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন? সর্ব্বসাধারণকে ভালবাসিয়া আপনাকে সেই ভালবাসায় ডুবাইতে পারেন নাই, তাই জ্ঞানমূর্ত্তির সমক্ষে একমাত্র পুরোহিত আপনাকে লইয়াই এত যন্ত্রণা পাইতে-ছেন!—তবু, আজ যখন তাঁহার পদমান সব গিয়াছে, যন্ত্রণা গভীরতম হইয়া উঠিয়াছে—তখন বুঝিতে পারি, এ যন্ত্রণার অবসান নিকটে। আর ইহাও দেখিতে পাইয়াছি যে, এই বেদনার জ্বালার সহিত মিশ্রিত হইয়া দুচারিটি ফুলপাতাও প্যারাসেল্‌সাসের অন্তর হইতে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে।

এই ত গেল প্যারাসেল্‌সাসের প্রাণের আশা—এখন পঞ্চমখণ্ডে অবতরণ করা যাউক।

ক্ষুদ্র অধ্যবসায়ে ব্যাপৃতজীবন হইলে, একবার ভুলপথ হইতে ফিরিয়া আবার পূর্ণতার পথে চলিবার সময় হয় ত এই জীবনেই থাকিতে পারে, কিন্তু প্যারাসেল্‌সাস্ এমনি প্রবল আবেগে, এত বিরাট্ কাজে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন যে,

এ জীবনে তাঁহার আর ফিরিয়া চলিবার সময় হইল না। তিনি পঞ্চম অঙ্কের পরে আবার ষষ্ঠ, সপ্তম অঙ্কে, মধুময় প্রাণ লইয়া আপনাকে চরিতার্থ করিবার অবসর পাইলেন না। এ কথাটা ঐতিহাসিক কিন্তু কাব্যের সৌন্দর্য্য ও ইহাতে নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। এইখানেই ব্রাউনিং মৃত্যুর গোধূলি-অন্ধকারের একটা ট্র্যাজেডি ঘনাইয়া, হঠাৎ প্যারাসেল্‌সাসকে জাগাইয়া দিয়া, মানবহৃদয়ের আশাকে তাড়িতালোকবৎ কম্পিত করিবার সুযোগ পাইয়াছেন এবং মৃত্যুর পরপারেও যেন সেই কম্পনতরঙ্গ ছুটাইয়া দিয়াছেন।

অন্ধকার-গুহায় আহত প্যারাসেল্‌সাস্ পড়িয়া। সম্মুখে তাঁহার চিরকালের বন্ধু ফেষ্টাস্। প্যারাসেলসাস্ প্রলাপ বকিতেছেন। কখনো করুণস্বরে তাঁহার অপমানকারীদিগকে সম্বোধন করিতেছেন, কখনো 'অ্যাপ্রিলে, অ্যাপ্রিলে' করিয়া আকুল হইতেছেন। বিফলতার প্রতি উপহাসপরায়ণ ভূতদের অবহেলা করিয়া বারবার আপ্রিলেকে ডাকিয়া লইতেছেন। ফেষ্টাস্ কিছুতেই প্যারাসেল্‌সাস্‌কে প্রবুদ্ধ করিতে পারিতেছেন না। ফেষ্টাস্ বিলাপ করিতেছেন—"একি হইল! করুণাময় পিতা! একি করিলে? এত-বড় জীবন এইরূপ বিধ্বস্তপ্রায় করিয়া ফেলিলে. আমি ত চিরকাল তোমার পদতলের শান্তিময় ছায়াখানির প্রতি চিত্ত নিবদ্ধ করিয়া আছি, আমি ত কখনো ভ্রান্ত হইয়া তোমার স্নেহময় দৃষ্টিকে হারাই নাই! আমার আর কি হইবে?—কিন্তু এই মহাত্মা! ইনি যদিও তোমাকে সর্ব্বদা স্মরণ করেন নাই, তবু তোমারি পথে ত গিয়াছেন! একি! কি করিলে?" ক্রমে প্যারাসেল্‌সাস্ জাগিয়া উঠিলেন—

কিন্তু বড়ই শ্রান্ত! "কেট্টাস্, তুমি একটা-কিছু বল। যা' ইচ্ছা, বল, শুধু তোমার কথা শুনিতে চাই!" কেট্টাস্ গান করিতে আরম্ভ করিলেন। "আরও, আরও গাও!" কেট্টাস্ আরও গাহিতে লাগিলেন।

প্যারাসেল্সাসের প্রাণ খুলিয়া গেল। যেন একটা ভয়ঙ্কর কালো সাপ প্যারাসেল্সাসের প্রাণের চারিধার হইতে কুণ্ডলী খুলিয়া লইয়া গানের স্বরে আস্তে আস্তে পলাইয়া গেল। প্যারাসেল্সাসের প্রাণ খুলিয়া গিয়াছে। "কেট্টাস্, আমি মরিয়া যাইতেছি,—জীবনের ঝড় থামিয়া গিয়াছে, এখন বুঝিতে পারিতেছি—কত-বড় আলোড়নটা হইয়া গিয়াছে। আজ আমার তরণী শান্ত-নির্ম্মল আকাশের তলে সরল স্রোতে চলিয়া যাইতেছে -কিন্তু কিসের উপর দিয়া চলিতেছি? জল না স্থল? সিন্ধু যে লতাপাতা-তরুশাখায় আপনাকে ঢাকিয়া প্রান্তরের মত হইয়া চলিয়াছে—কত শাখা, কত পাতা, উড়িয়া যাইতেছে, গাছ উন্মূলিত হইয়া, উল্টা হইয়া উড়িয়া চলিয়াছে, এখনও তাহাতে পাখী রহিয়াছে—কত তীর ভাঙিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। আমার সমস্ত গতজীবনটা যেন আমার চক্ষের উপর ছুটিয়া যাইতেছে - আমি একই কালে যেন যৌবন, প্রৌঢ়বয়স, বার্দ্ধক্য, সমস্তে আপনাকে খণ্ডিত করিতেছি। আমি সমস্ত জীবনটা দেখিতে পাইতেছি, অথচ তাহার ভিতরে আমি মগ্ন নহি—আমি যেন মুক্ত হইয়া চলিয়াছি—প্রতি মুহূর্ত্তে শক্তি বাড়িয়া উঠিতেছে, যেন ডুব দিবার আগে প্রাণে নানা নূতন অনুভব-শক্তি জাগিয়া উঠিবে"—বলিতে বলিতে যেন প্যারাসেল্সাসের শীর্ণগণ্ড প্রভাময় হইয়া উঠিল, কঠোর যৌবনের

সমারোহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল—শূন্যের উপর আঙুল আঁকিয়া আঁকিয়া, যেন একখানা খোলা বহির পংক্তি অনুসরণ করিতে করিতে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্যারাসেল্‌সাস্‌ বলিতে আরম্ভ করিলেন। "কোথায়? আমার পক্ষিপালক-শোভিতপ্রান্ত রক্তবর্ণ গাউন্‌ কোথায়? আমি দাঁড়াইয়াই বরাবর বক্তৃতা করিতাম! আমার তরবারি আমার হাতে দাও—

"ফেষ্টাস, সত্যসত্যই জানিতাম। জানিতাম, কি মহৎ কার্য্যের জন্ত আমি আসিয়াছিলাম। অনেকে অন্তরের কথা ঠিক না শুনিয়া এদিক্‌ ওদিক্‌ ছুটিয়া মরে, শক্তির অপব্যয় করে—আমি প্রথম হইতেই আমার অন্তরের কথা জানিয়াছিলাম। জীবনের সমগ্র ক্ষেত্র আমার চক্ষে ভাসিয়াছিল। জানিতাম, এক অনন্তকালস্থায়ী শান্তিকেন্দ্র হইতে জগতের সমস্ত বাহির হইয়া আসিতেছে, সমস্ত শক্তি ছুটিয়া আসিতেছে। ক্ষুদ্রতম প্রাণীর জীবনলীলাও সেই ব্রহ্মের মধ্যে সম্পাদিত হইতেছে। আনন্দের কণামাত্র যেথায়, ব্রহ্ম সেথায় বিরাজ-মান। নিয়তই দূরে এক পূর্ণসুখের ধ্রুবতারাকে চক্ষে রাখিয়া, সুখ, চক্র হইতে পরিবর্দ্ধিত চক্রে আরোহণ করিয়া চলিয়াছে। ধরণীর কেন্দ্রগহ্বরে বহ্নি জ্বলিতেছে, ধরণীর মুখ মনুষ্যমুখের মত রং ফিরাই-তেছে, গলিত তপ্তধাতু পাথর বিদীর্ণ করিয়া খনির মধ্যে শাখায়িত হইয়া রং গাঢ় করিতে করিতে চলিয়া যায়, শুষ্ক নদীর তলায় পিঠ জাগাইয়া অবশেষে সূর্য্যালোকে কোথায় বাহির হইয়া চূর্ণবালুবৎ ঝরিয়া পড়ে,—ব্রহ্ম সেই আনন্দে মগ্ন। সমুদ্রতরঙ্গ সফেন শুভ্র হইয়া উঠে,—দগ্ধ, নির্জ্জন প্রান্তরে অদ্ভুত আগ্নেয়গিরিদল ভূতের মত

উঠিয়া আসে— অগ্নিনেত্রে পরস্পরের দিকে চাহিয়া থাকে—ব্রহ্ম সেই আনন্দে মগ্ন। তার পরে ধরণী শীতে স্তম্ভিত—হঠাৎ বসন্ত কোথা হইতে নাচিতে নাচিতে আসিয়া ধরায় সঞ্জীবনী সুধা ছড়াইয়া দেয়, বন্ধুর গিরিতটে শুষ্ক শিকড়জাল ও তুষারস্ফোটের ভিতর হইতে এখানে সেখানে এক আধটি নবাঙ্কুরের শ্যামশোভা উদগত হইতে থাকে,— মনে হয়, একটি হাসির রেখা যেন অতিকষ্টে একটা বলীকুঞ্চিত মুখের উপর আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করিতেছে!—এদিকে আবার পতঙ্গ-প্রজাপতি সূর্য্যালোকে উড়িয়া বেড়ায়, পিপীলিকা সার বাঁধিয়া কাজে যায়, বিহগদল আনন্দগানে বিভোর হইয়া ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে ছুটিতে থাকে, দূরে মহাসাগর ঘুমাইয়া পড়ে, অরণ্যে-প্রান্তরে ভীষণ আরণ্যজন্তুরাও তাহাদের প্রীতিভাজনকে খুঁজিয়া বেড়ায়,—ব্রহ্ম সেই আনন্দে মগ্ন। জড়জগতে আনন্দবোধের কণা ছড়ান রহিয়াছে, মানুষে আসিয়া সব কেন্দ্রীভূত হইল। এই পর্য্যন্ত জীবনের এক অধ্যায় সমাপ্ত। মানুষের কেন্দ্র হইতে আলোক বাহির হইয়া পশ্চাতের জগৎটিকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। মানুষ পশ্চাতে ফিরিয়া আপনার ইতিহাস খুঁজিয়া দেখে, ক্রমে সকল পদার্থে আপনার ভাব মাখাইয়া দিতে থাকে ;—পবনপ্রচারে শব্দ উঠে, কখনো হাস্য, কখনো জড়িতকলহ। দেবদারুদল জগতের নয়কবারের ন্যায় অন্তর্হর্ষ্যকে কাণ্ডপংক্তি দ্বারা আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া সন্ধ্যায় কোন্ গভীর কথার আলাপ করে—অরণ্যের বৃক্ষাগ্রে কোন্ বনদেবতার বাঁকা চক্ষু উঁকি মারিয়া চাহিতে থাকে। প্রভাতকাল উল্লাস-উদ্যমে ভরিয়া উঠে, সন্ধ্যার সঙ্গে গভীর বিরাম আবির্ভূত হয়, অন্তকালের

সিন্দুরচ্ছটা হইতে বিজয়গান ধ্বনিত হইয়া উঠে, কাহার সহাস্য মুখের ন্যায় পূর্ণচন্দ্রের আলোকে বিলাসরসে শস্য আপনাকে পাকাইতে থাকে। ক্রমে মানুষ, আরও সম্মুখে, আরও সম্মুখে চলিয়া যাউক্—সমস্ত জাতির জাগরণ নহিলে চলিবে না। এই যে সমাজদেহ নিদ্রিত রহিয়াছে!—একটি-দুটি অঙ্গ স্পন্দিত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে হইবে কি?—সমস্ত দেহটিকে জাগিতে হইবে। অধর স্ফুরিত হইয়া আধ-আধ কি-কথা অনেকদিন হইল উচ্চারিত হইয়াছে—নিশ্বাস জোরে বহিয়াছে—এক একবার দৃঢ় দক্ষিণবাহু মুষ্টিবদ্ধ হইয়া যেন সিংহের ব্যাদানকে আকর্ষণ করিতে চাহিয়াছে, তবু এখনো আদ্যোপান্ত নিদ্রিত। যেদিন জাগিবে, সেইদিনই আবার মানুষকে দেবরাজ্য-অভিমুখে চলিতে হইবে। আজই মানবের অন্তরে কত বিরাট্ আশা জাগিতেছে, কত গভীর ব্যাথা আন্দোলিত হইতেছে—তাহার জন্য পরিবর্দ্ধিত ক্ষেত্র চাই। মানুষেই ঈশ্বরের মহিমা জাজ্বল্যমান—আমি মানুষের জন্যই দেহমন সমর্পণ করিয়াছিলাম—সবই জানিতাম, তবু আমি বিফল হইয়াছি। শক্তির দিকে চাহিয়া আমার চক্ষু ঝলসিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম, শক্তিই মানুষের সার ধন। দুর্ব্বলতা, ভ্রম, আমি অকর্ম্মণ্য বলিয়া রাখিয়া দিলাম। অতীতকে অসম্পূর্ণ বলিয়া অবহেলা করিলাম। হে ভবিষ্যতের শিশু! তুমি তাহা করিও না,—অতীতের শিক্ষায় সতর্ক হইয়া তুমি চলিবে। অন্ধকার-অতীতের পার্শ্বে বর্ত্তমান তাহার আলোক লইয়া কাঁপিবে। ভাবিও না—অমনি ভবিষ্যৎ, সফলতা লইয়া উপস্থিত হইবে। অনায়াস আনন্দে স্বর্গমণ্ডল হইতে স্বর্গমণ্ডলে পক্ষীর মত উড়িয়া যাওয়া মানুষের

ভাগ্যে নাই। বহু বেদনার মধ্য দিয়া অনেকদিন ধরিয়া ধীরে ধীরে আনন্দে উপস্থিত হইবে—আশা-ভয়-প্রেমে এই সুদীর্ঘকাল মানুষকে মানুষ করিয়া রাখিবে। আমি অ্যাপ্রিলের কাছেই প্রেমের মহিমা জানিতে পারিয়াছিলাম—ঐ যে আমার অ্যাপ্রিলে দাঁড়াইয়া আছে। প্রেমই আগে। প্রেমের প্রেরণায় শক্তি জাগিয়া উঠিয়া কার্য্যে ধাবিত হইবে তাই, আমি আর অ্যাপ্রিলে এই দুজনকে মিশাইয়াই একটি মাঝামাঝি জগৎ নির্ম্মিত হইবে—সেই মানুষ! ফেষ্টাস্, আজ আর আমার ভয় নাই। আজ আমি ভণ্ড বলিয়া পরিচিত হইলাম, ভালই হইয়াছে—যাহা অপরাধ, যাহা দুর্ব্বলতা ছিল, তাহার শাস্তি হোক—কিন্তু একদিন আমাকে সবাই জানিবে, আমি জগদীশ্বরের প্রদীপ বক্ষে চাপিয়া ধরিয়াছি, একদিন প্রকাশিত হইব। অ্যাপ্রিলে, তোমার হাত আমাকে দাও, অ্যাপ্রিলের সঙ্গে হাতাহাতি করিয়া আমি চলিলাম।"

প্যারাসেল্‌সাস্ চলিয়া গেলেন।

'প্যারাসেল্‌সাস্' কাব্য আলোচনা করিলাম। এই আলোচনা-গুলিতে ব্রাউনিংএর কবিত্ব জানাইয়া দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। যাঁহারা ব্রাউনিংকে জানেন, তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। অনুবাদে আলোচনায় প্রচুরভাবে ব্রাউনিংএর বাক্যাবলীই আমি বাংলায় প্রদান করিয়াছি।

প্যারাসেল্‌সাসের প্রথম খণ্ডে অতিবিস্তৃত কথোপকথনে, বহু-শাখায়িত তর্কযুক্তিতে প্যারাসেল্‌সাসের জ্ঞানাকেন্ডের উৎসাহই দেখিতে পাই। দ্বিতীয় খণ্ড পরম কবিত্বময়। তৃতীয় ও চতুর্থ

খণ্ডে ব্রাউনিং আমাদিগকে একটি মানবহৃদয়ের গুহায় নামাইয়া লইয়া নানারূপ তীব্রভাবের পরস্পর তাড়না অপূর্ব্বশক্তিসহকারে দেখাইয়া দিয়াছেন। চতুর্থ খণ্ডটি পরম রমণীয়। অবশেষে পঞ্চম খণ্ডে মৃত্যুর অন্ধকারে প্যারাসেল্‌সাসের মূলজ্ঞানপ্রাপ্তির আনন্দ অতি চমৎকার।

প্যারাসেল্‌সাস্ সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিবার আছে। সে এই পঞ্চম অঙ্ক। ব্রাউনিং ইহা কোথায় পাইলেন? অবশ্য সমস্ত খণ্ডেই ব্রাউনিং মানুষটির গভীর হৃদয়গুহায় নামিয়াছেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু চতুর্থখণ্ড পর্য্যন্ত প্যারাসেল্‌সাসের যে জীবন, তাহা তাঁহার প্রাপ্ত ইতিহাস হইতে সহজেই নিষ্কাশিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে; কিন্তু পঞ্চম খণ্ড অর্থাৎ 'প্যারাসেল্‌সাসের অভয়লাভ' ইতিহাসে আছে কি? এটুকু ব্রাউনিং জুড়িয়া দিয়াছেন। এইখানেই ব্রাউনিংএর ক্ষমতা!—খণ্ড ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত সম্পূর্ণতায় দৃষ্টি-প্রসারণেই কবির মাহাত্ম্য। মানবজীবন ক্ষণিক অন্ধকার সত্ত্বেও যে যুক্তি-শৃঙ্খলা-সৌন্দর্য্যে পূর্ণ, বিশৃঙ্খল বাহ্যঘটনা বিদীর্ণ করিয়া কবি তাহাই দেখাইয়া দিতে পারেন। প্যারাসেল্‌সাসের সেই দুর্লক্ষ্য অথচ নিতান্তই সত্য, জীবনের শেষ অঙ্কখানি, মানবহৃদয়ের মর্ম্মচারী ব্রাউনিং স্বভাবতই জাগাইয়া তুলিয়াছেন। আর্ট-হিসাবে অঙ্কগুলির সম্পূর্ণতাই বা কি চমৎকার! এই কাব্যটির আদ্যোপান্ত অনুধাবন করিয়া মনে হইল, একটি মানবহৃদয়ের, অন্ধকার এবং রত্নজ্যোতিজড়িত একটি গভীর প্রদেশ অতিক্রম করিয়া চলিয়া আসিলাম। সমুদ্রের ধ্বনির ন্যায় সেই গভীর হৃদয়ের ধ্বনি আমার কর্ণে বাজিতেছে।

স্বপ্নপ্রয়াণ।

[২য় সংস্করণ]

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

বাংলাসাহিত্যের প্রবাহে, কিছু পশ্চাতে, একখানি কবিতার দ্বীপ নিজের সূর্য্যাস্তবর্ণবিলাসে, বনান্ধকারে, শৈলপ্রাকারে,—নিজের অধ্যাত্ম আনন্দের স্বপ্নে অভিনিবিষ্ট হইয়া বসিয়া আছে—এখনো সেখান হইতে আমাদের জীবনের সঙ্গে বৃহৎ সেতু পড়িয়া যায় নাই। বাস্তবিক সেকালের অন্যান্য কবিতার পার্শ্বে স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যখানিকে ধরিয়া দেখিলে অনেক কথা মনে হয়। ম্যাথু আর্নল্ড কবি গ্রের সমালোচনায় বলিয়াছেন যে, গ্রে একজন সুন্দর কবি ছিলেন, কিন্তু পোপ্‌ ড্রাইডেনের গদ্যময় যুগে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া তিনি বেশি কবিতা লিখিতে পারেন নাই,—তাঁহার শ্রেষ্ঠতর কবিত্ব চারিদিকে গদ্যের চাপে প্রচুররকমে উৎসারিত হইতে পারে নাই। এই উক্তিতে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে একটি ছবি জাগিয়া পড়ে। মনে হয়, যেন চারিদিকে একটা ধূম্রমণ্ডল—দূরে এককোণে কোথায় একটি কিংশুক-বর্ণ জ্যোতিঃশিখা কাঁপিতেছে, ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে—এখনো তাহাকে কেহই দেখিতেছে না। বাস্তবিক জন্‌সন্‌ গ্রেকে সরাসরি 'Barren rascal' বলিয়াই সমালোচনা সাঙ্গ করিয়াছিলেন।

সেকলের কবিতার অনেক গুণ থাকিতে পারে—কিন্তু স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যখানি হইতে যে একটি মধুর রঙীন জ্যোতি বাহির হইয়া আসিতেছে, স্বপ্নপ্রয়াণের মধ্যে যে একটি জীবনের আন্দোলনীলা দেখিতে পাই—এবং এই কাব্যের ভাষায় যে একটি অপূর্ব্ব নৃত্যছন্দের আবাস

পাওয়া যায়—তাহাতে আমাদের চিত্ত আনন্দের রশ্মিঘাতে জাগিয়া উঠে, একটি বিরল কবিত্বলোকের মধ্যে উদ্ভ্রান্ত হইয়া যায়—ইহা সেকালের অন্যান্য কবিতায় প্রায় একেবারে দুর্লভ।

চিত্র ও তাহার সঙ্গে ভাষার মনোহারিত্বই স্বপ্নপ্রয়াণে প্রথমত চোখে পড়ে। অনেকের লেখা যেন বিমর্ষভাবে শুইয়া থাকে,—পাঠক তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া লইয়া, পাঠক তাহাতে নিজের কল্পনা প্রয়োগ করিয়া—তবে কোনোমতে ভাবটাকে জাগাইয়া লইয়া যাইতে সমর্থ হয়। আবার কোন কোন লেখায় বেশ ভদ্রলোকের মত পাঠকের সঙ্গে হাতাহাতি চলিতে থাকে—যতই সুন্দর, যতই গম্ভীর ভাব ব্যক্ত করা তাহার উদ্দেশ্য হোক কথাবার্তাটি বেশ ভব্যরকমের। আর-এক-রকম লেখা আছে, যেখানে পাঠককে ক্ষণে ক্ষণে শ্বাস রুদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়, অনেকগুলি শুষ্ককথার জাল ঘুরিয়া-ফিরিয়া তবে একটি চিত্র উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু স্বপ্নপ্রয়াণের লেখায় পদে পদে বিস্ময়ের আবির্ভাব, কথায় কথায় অপ্রত্যাশিত, অভাবিতপূর্ব্ব অথচ চিরপরিচিত চিত্ররাজি। ভাষা চোখেই পড়ে না, চিত্রই জাগিয়া উঠে। যেখানে বা চিত্র নাই, সেখানেও ভাষার একটি অবলীলাকৃত সজীব ভঙ্গীতে পাঠকের মন উদ্যত হইয়া থাকে।—এইরূপে আদ্যোপান্ত মনটি সজাগ হইয়া বসিয়া থাকে এবং অবিরাম একটি বিচিত্র জীবনের আনন্দে মাতিতে থাকে।

"সুষুপ্তিতে ডুবিয়া গেল জাগরণ—
সাগরসীমায় যথা অস্ত যায় জলন্ত তপন।
স্বপনরমণী আইল অমনি।"—

এই প্রথম তিন ছত্র পড়িতেই বোধ হয় যেন দৃশ্যপটের উপর অস্তগামী তপনের বর্ণচ্ছটাকে অনুসরণ করিয়া একটি গভীর স্বপ্নাবেশ চক্ষের উপরে আসিয়া আবির্ভূত হইতেছে। ক্রমে—

"ছোঁয় কি না ছোঁয় মাটি,

আঁচল ধরায় পড়ে লুটি"—

এইরূপ গমনে স্বপ্ন আসিয়া দু'চার ছত্র পরে যখন একটি পদ্মফুল—

"বুলাইল কবির মুখে চক্ষে নাসিকায় শিরে"—

তখন আবেশটি আরও নিবিড় হইয়া উঠে। ক্রমে দেখা যায়, সমস্ত প্রথম প্রয়াণটি ব্যাপিয়া কেমন একটি শিথিল, লুণ্ঠিত, অলস ও একটি স্তম্ভিত-বিস্মিত ভাবের ঘোর লাগিয়া রহিয়াছে।

উদাহরণস্বরূপে এতখানি বলা হইল। কিন্তু সকল স্থলেই এইরূপ—যখন যে ভাব, তখন সেই ভাবের আশ্চর্য্যরকমে, পরিপূর্ণ-রকমে উদ্বোধন দেখা যাইবে। বহির্জ্জগতের এত চিত্র, এত পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র বাংলার আর কোন কাব্যেই নাই। শব্দের এমন ক্ষমতা যে, উচ্চারণমাত্র চক্ষে চিত্র উপস্থিত হয়, যথা—

নদী,—

সরিৎ সরিৎ বহে তট চুমি' চুমি'!

ফোয়ারা,—

ছুটেছে ফোয়ারা হর্ষে মাতোয়ারা

শূন্যে চড়ি উঠিয়া ধরিতে যায় গগনের তারা

না পেয়ে নাগাল ছাড়ি দিয়া হাল

মনোদুখে অধোমুখে কাঁদি হয় সারা।

সুরভি মন্দানিল—

আহা আহা সুমন্দ মৃদু সমীর

ফুলের প্রাণের কথা আনিতেছে করিয়া বাহির।

ভাঙা-দালানে বায়ু—

জানালা ঠেলিয়া বায়ু চলি যায় বলি 'সর সর'।

পাতাল—

শ্রবণপ্রবণ গহ্বরভবন

* * * *

টুঁ শব্দটি হইলেই তাড়াতাড়ি

তাহারে লুফিয়া লয় দশদিক্ করি কাড়াকাড়ি।

—ইত্যাদি। এইরূপ প্রতি ছত্রে। শুধু বাস্তব নহে, মনের একেকটি ভাবও অপূর্ব্ব কাল্পনিক চিত্রে উদ্ভাসিত হইয়াছে। যেমন,—মনোরাজ্যের নামে কবি আনন্দে বিভোর হইয়া বলিতেছেন—

"মনোরাজ্য নামটি মধুতে ভরা

ফুটে যথা পারিজাত বিচরে গন্ধর্ব্ব অপসরা

জলি স্বর্ণরেণু চরে কামধেনু

কল্পতরুছায়াতলে রঙ্গে হাসে ধরা।"

এই শ্লোক কালিদাস লিখিতে পারিতেন। এই শ্লোকে আনন্দের অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্য অলকাপুরীর চিত্রে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এইটি আবার বিশেষ করিয়া বারবার বলি যে, এইরূপ চিত্র যে শুধু একটিছুটি হঠাৎ এখানে-ওখানে পাওয়া যায়, তাহা নহে,—এইরূপ চিত্রাবলী প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত। বাস্তবিক,

স্বপ্নপ্রয়াণ ব্যক্তিত্ববিহীন গভীর ভাব উদ্বোধনেরই কাব্য—মানবের অধ্যাত্মজীবনের একটি পরিণতিক্রমই ইহাতে উদ্ভাসিত হইয়াছে। প্রথম সেই অধ্যাত্মরাজ্যের পরিণামক্রমটি মনের মধ্যে স্থির করিয়া ধরা; ক্রমে বহির্জগতের যথাযথ চিত্রে সেইটিকে পরিস্ফুট করা, মনোভাবের ভূতগুলিকে যাদু করিয়া মানুষমানুষীবেশে নদীকান্তার-গিরিবনে পরিভ্রমণ করানো; চিত্রের যথাকাল ও যথাভাবগুলিকে অনুরূপ ছন্দের লীলায় প্রকাশ করিয়া তোলা; এবং ছন্দগুলিকে সজীব ও উজ্জ্বল শব্দমালায় গাঁথিয়া উঠানো—এইরূপে স্বপ্নপ্রয়াণের আদ্যোপান্তই একটি অতি উজ্জ্বল পরিস্ফুটনক্রিয়া চলিয়াছে। এই অপরূ, পরিপূর্ণ পরিস্ফুটনক্রিয়াটির মধ্যে একটি অসাধারণ মনঃশক্তির বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইতেছে। এই মনটির কল্পনা-সম্পদ্, ছন্দসম্পদ্ ও ভাষাসম্পদ্ সাগরের মত অশেষ। ইহার অনুভাব—গাম্ভীর্য্যেরই হোক্ আর সৌন্দর্য্যেরই হৌক্—ইহার অনুভাব এবং প্রকাশক্ষমতা—অর্থাৎ কবির প্রধান দুটি গুণ—প্রচুররূপে বর্ত্তমান। প্রকাশের কথায় আবার অনেক চিন্তা মনে উঠে। কোন কোন কবিতায় বাস্তব-চিত্রগুলিকে জড়াইয়া চারিদিকে এমন একটা সঙ্গীতের মেঘ জমিয়া উঠে যে, চিত্রগুলিকে ভালমত দেখা যায় না, তাহার চারিদিক্ আবিষ্ট করিয়া একটা কুহেলিকার ঘোরের মত থাকে—এটা অবশ্য আমাদের মনের বিভ্রমের ফল, আমাদের মনটাই সঙ্গীতের দ্বারা এস্থলে আবিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এই মেঘটা কাটিয়া-কেলিয়া শব্দ-গুলিকে বেশ লঘু, শুভ্র রকমের করিয়া লইতে পারিলেই চিত্রগুলিকে বিশেষ উজ্জ্বল করিয়া ফলানো যায়। স্বপ্নপ্রয়াণে এইরূপ ভাবাই

দেখিতে পাই—অথচ সর্ব্বত্রই একটি মৃদুল, ললিত রকমের ধ্বনি খেলা করিয়া যাইতেছে। এখন দেখা যাউক, ঠিক এইরূপ শব্দ এবং খুব ভাবপ্রকাশক্ষম শব্দ কোন্‌গুলা। সহজেই বুঝা যাইতে পারে—সে আমাদের ঘরের ভাষা, সে আমাদের প্রতিদিনের কথা-বার্ত্তার জীবন্ত idiomatic বা যোগরূঢ় ভাষা! স্বপ্নপ্রয়াণের কবির যেমন বাংলার এই যোগরূঢ় ভাষার উপর হাত আছে, এরূপ আর আমাদের কোন কবিরই নাই। এই কাব্যে, আমাদের জীবন্ত, সক্রিয়, ঘাতশীল প্রতিদিনের গদ্য হইতে শব্দ বাছিয়া আনিয়া সেই ভাষার মধ্যেই নানারসের জোয়ার ছুটাইয়া দেওয়া হইয়াছে,—বিচিত্র সংস্কৃত শব্দগুলিকেও দেশী বাংলার সঙ্গে গলাইয়া, নানা বিচিত্র মিলের তটে বাঁধিয়া, নানারূপ ছন্দের খাতে প্রবাহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমাদের চিরপরিচিত বন্ধু যে এত কথা কহিতে পারে, আমাদের গৃহদ্বারের স্রোতটি যে গিরিশিখর পর্য্যন্ত উঠিতে পারে, পাতাল পর্য্যন্ত ডুব মারিতে পারে—ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়। স্বপ্নপ্রয়াণের এইরূপ দেশী ভাষা বলিয়াই, ইহার চিত্রগুলি এত অনায়াসে আমাদের চক্ষের উপর নাচিয়া উঠে, ভাব-গুলি নেশায় ধরার মত এত চট্ করিয়া আমাদের মনটিকে ধরিয়া ফেলে!—স্বপ্নপ্রয়াণ নিতান্তই দেশী। এই কাব্যখানির এত ঔজ্জ্বল্যের অন্যতম কারণ এই দেশীয়তা। কেবল ভাষাই নহে, ইহার ভাব-সম্পত্তিও নিতান্তরূপে দেশী। আনন্দরাজার সভা, হরষ-উল্লাস দুটি বালকের ব্যবহার; নন্দনপুরের বন-নদী-কান্তারের দৃশ্য; চিত্রলেখার হস্তে সরস্বতী, যশোদা, সীতা প্রভৃতির চিত্র;—নৌকায়

চড়িয়া প্রমোদপুরে গমন ; প্রমোদপুরের চটুল, বিলাসী অধিবাসিগণ ও সভার রঙ্গময় নৃত্যগীত ;—বিষাদপুরের তালবেতাল, পেত্নিনী মাসী, বীভৎস অরণ্য ;—বিষাদপুরের বিড়ালের খঞ্জনী বাজান, কাকাতুয়ার 'টাকুটাকু আহারে' 'কালো যেন লোহা' রসনা নড়ান, হাড়গিলার থলিয়া ঝুলান ;—বিষাদপুরের হাহা-হুহু গন্ধর্ব্ব, কাভা মন্ত্রী, অন্ধকার-সভা ; রসাতলের গভীর অন্ধকারে ভৈরব কাপালিক, কালীপূজা, শ্মশান, উল্কামুখী, বড়াইবুড়ী প্রভৃতি ;—সমরপ্রয়াণে যুদ্ধের বর্ণনা ; মৈত্রদেবের 'বন্ধনপাশ' ত্যাগ করা ; ছুতিকের অগ্নিবাণ-বৃষ্টি, বাণে বাণে কাটাকাটি ; এবং অবশেষে শান্তিপ্রয়াণের তপোগিরি, শ্রেয়, শ্রেয়ঃপথ, স্বর্ণবেত্রহস্তে সুসঙ্গ ; গিরিশিরে দাঁড়াইয়া ঋষিদলের স্তবগান—সর্ব্বত্রই আমাদের স্বদেশী প্রাকৃতিক দৃশ্য, দেশী বিচিত্র রূপকথা ও কাহিনী, আমাদের পরিচিত তান্ত্রিক-সাধনার ভীষণতা, দেশী ছবি, দেশী রামায়ণ-পুরাণের যুদ্ধবর্ণনা এবং আমাদের স্বদেশী ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা আমাদের মনে পড়িয়া যায়। ইহার অধ্যাত্মতত্ত্বটিও আমাদের স্বদেশী।

এই-ই স্বপ্নপ্রয়াণের শক্তির অন্যতম মূলকারণ। স্বপ্নপ্রয়াণের এই দৃঢ়, অনন্ত, স্বদেশী ভাবটির কাছে বাংলার অন্যান্য কাব্য নিস্তেজ—কারণ, একে ত বিদেশী ভাবের অনুকরণ কিছুতেই দেশী ভাবের মত স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না—তার পরে আবার স্বপ্নপ্রয়াণের মত বাস্তবানুভূতি, তাহার এমন সম্পূর্ণ অধিকার কোনো কাব্যেই দেখা যায় না। তবেই দেখিতে পাই, স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যখানি নিতান্ত দৃঢ়। এই দৃঢ়-ত্বের যাহা অন্যতম প্রধান কারণ, এখন তাহাতেই অবতীর্ণ হওয়া যাউক।

অনেকেই কোন একটা বিষয়ে কাব্য লিখিতে হইবে, অন্যকে নিজের শক্তি দেখাইতে হইবে—এইজন্য কাব্য লিখিবার একটা বিষয় অনুসন্ধান করিতে নামিয়া পড়েন। ইহার ফল এই হয় যে, যাঁহারা ভাগ্যক্রমে নিজের শক্তির উপযোগী বিষয় পাইয়া যান, তাঁহাদের যা-হোক-কিছু-একটা দাঁড়ায়; কিন্তু যাঁহারা তাহা না পান, তাঁহারা এদিক্-ওদিক্ করিয়া একটা মূঢ় বিশৃঙ্খলরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকেন। কিন্তু সেই কবি কোথায়, যিনি নিজের একটি আনন্দে সর্ব্বাগ্রে বিভোর হইয়া, ভরপুর হইয়া আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া গাহিয়া উঠিয়াছেন? এইরূপ কবিগণ যখন কবিতা লিখিতে থাকেন, তখন ইঁহাদের কোন লোকের কথা মনে থাকে না, যশ মনে থাকে না,—মনে, সকলের উর্দ্ধে জাগিয়া থাকে—আনন্দের জ্যোতির্ম্ময় গিরিচূড়া এবং তাহারি পাদমূলে তাহারি স্তবগীতচ্ছন্দে মনের সমস্ত শক্তি হিল্লোলিত হইয়া নৃত্য করিয়া বেড়াইতে থাকে। এইরূপ কাব্যের পাঠকেরা একটি সুদূর, আপনাতে-আপনি-বিলসিত আনন্দের আভাস পাইয়া ধন্য মানিয়া যায়। আমরা স্বপ্নপ্রয়াণে এইরূপ আনন্দের আভাস পাইয়াছি। যে অধ্যাত্মজীবনের বিবৃতি স্বপ্নপ্রয়াণে দেখা যায়—তাহা কবি কাব্য লিখিবার মানস করিয়া খুঁজিয়া বাহির করেন নাই—আগে হইতেই তাহার মধ্যে ডুবিয়া ছিলেন। পরিচয় কোথায়? পরিচয় এই কাব্যের উদার স্ফূর্ত্তিতে, পরিচয় ইহার যথাযথ পরিমাণে। কিন্তু পরিষ্কার-বলিয়া-দেওয়া পরিচয়ও আছে—কাব্যের আরম্ভেই আছে, যেমন সংস্কৃতকাব্যে থাকিত—তাহার কতক অংশ এই প্রবন্ধেরই আরম্ভভাগে উদ্ধৃতও করিয়াছি; অপর অংশ এই:—

কবি কল্পনাকে বলিতেছেন,—

"রাজ্য পাইলাম হাতে 'মনোরাজ্য' শুনি।
তোমা সঙ্গে তথায় না যাব যদি
কেন তবে এতেক সাধ্যসাধনা শৈশব-অবধি !
অই মম জপ, অই মম তপ
অই চাঁদে উনমাদ বাসনা-জলধি।"

এই আবেগপূর্ণ উক্তিতেই সেই আনন্দের পরিচয়।

আমি যতদূর বুঝি, ততদূর স্বপ্নপ্রয়াণের মূল সৌন্দর্য্যগুলি বিবৃত করিলাম। এখন একটি প্রশ্ন করিবার সময় উপস্থিত। এত সুন্দর, এত অলকার মায়াময়, এত অদ্ভুতপৌরুষবিশিষ্ট কাব্যখানি—তবু ইহার আদর কেন হয় নাই? কাব্যামোদী অল্পসংখ্যক লোকের কাছে আদর হইলেও স্বপ্নপ্রয়াণ বাংলাদেশে প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই, ইহা স্থির। কেন? ইহার কারণ কি? কারণ সেই গ্রে এবং পোপ্। কারণ সহজ ভাষা ও গভীর সৌন্দর্য্যের অমূল্য মাহাত্ম্য অনেকেরই তখন অধিগম্য ছিল না। কিন্তু আরও কারন থাকিতে পারে। সে হচ্ছে এই যে, স্বপ্নপ্রয়াণ রূপক। রূপক ব্যক্তিত্বের সার্ব্বভৌমিক ভিত্তির উপর দাঁড়ায় না, সে মনোরাজ্যের সুদূর গুহায় ভিত্তি পাতিত করে। ভাবিয়াও দেখি, স্বপ্নপ্রয়াণে ব্যক্তিত্বের সংঘাতোত্থ ঘূর্ণা নাই—ইহার স্বপ্নসৃষ্ট দল, একের পর আরেকটি, স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে;—এগুলির উপর মানুষের কতকটা আকারপ্রকার দেওয়া হইয়াছে মাত্র—হৃদয়ের গভীর করুণা, শোক, সন্দেহ প্রভৃতির বিচিত্র কুটিল আবর্ত্ত ইহার মধ্যে দেখা

যায় না—এ কাব্যে ব্যক্তিত্বের ইন্দ্রজাল নাই। এইরূপ একটা কারণ থাকিতে পারে—কিন্তু তথাপি যদি কবিত্ব আদৃত হইত, তবে এ দোষটা গণনা না করা যাইতেও পারিত। যে ভাবে আছে, ইহাকে সেই ভাবেই কেন গ্রহণ করা যাউক না? ইহা স্বপ্নপ্রয়াণ নাম ধরিয়া, ইহার সুন্দর বিকটগম্ভীর অত্যুজ্জ্বল স্বপ্নরাজ্য সৃজনের দ্বারা নিজের নাম সার্থক করিয়াছে—আমরা সেই ভাবেই কেন ইহার মধ্যে প্রবেশ না করি? সেই ভাবে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা থাকিলে আমরা স্বপ্নপ্রয়াণে আমাদের চিত্তকে বহুবহু দূরে—বহু রত্নদ্বীপের উপ-কূলে, বহু গুহার শ্রবণপ্রবণ অন্ধকারে সাঁতার দেওয়াইয়া, একটি অদ্ভুত শক্তির আনন্দে জাগ্রত হইয়া উঠিতে পারিব—নিরঞ্জন নেত্রে সহসা জগৎ জ্যোতির্ম্ময় হইয়া দেখা দিবে, নির্ম্মুক্ত শ্রবণকুহরে আনন্দের বিশ্বব্যাপী বন্দনাগান ধ্বনিত হইয়া উঠিবে। তবুও কিন্তু অনেকেই আদর করিল না—তাহার কারণ আছে, যথাঃ—পরিপূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করিয়া দেখাইলেও, স্বপ্নলোকে প্রয়াণ করিবার শক্তি সকলেই রাখে না। অনেক লোকই কর্ম্মিষ্ঠ সংসারী ব্যক্তি,—কাজ-কর্ম্মের অবসানে দিব্য নিদ্রা দিয়া আরাম লাভ করে। সেই নিদ্রার মধ্যে বিকৃত স্বপ্ন অনিবার্য্যরূপে তাহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়ে, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই—কিন্তু জাগিয়াও এতটা নিষ্ফল স্বপ্ন লইয়া বসিয়া থাকিবার শক্তি অনেকেরই নাই। অথচ যদি রীত্যনু-সারে সংস্কৃতশব্দের হাতীতে চড়াইয়া, অতি বিকৃত সাজসজ্জাতেও, কতগুলা ক্ষণিক বাহ্যিক রূঢ়দেবতাকে বাহির করিতে পার—তবে ইহারা দাঁড়াইয়া চীৎকারস্বরে বাহবা দিবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

স্বপ্নামোদিগণ এই দলের জন্য কৃপা রাখিয়া অচিরেই আবার সেই বিচিত্র স্বর্গ-রসাতল-অভিমুখে পলায়ন করিয়া থাকেন।

জনশূন্য পৃথিবী।

হে মহাকায় ধূর্জ্জটি, তোমার জটার ভারে স্তম্ভিত হইয়া আর কতকাল তুমি ঘুমাইয়া থাকিবে? একবার জাগো। বুদ্ধি বলিয়া যে একটা থাপছাড়া জিনিষের তাড়নায় কলের ধোঁয়ায়, গির্জার চূড়ায়, সঙিনের খোঁচায়, কলমের আগায় তোমার ধরণী ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠিয়াছে!—তুমি তোমার তিনটি রক্তনেত্র মেলিয়া এই পৃথিবীর চারিদিকে একবার তোমার ভাঙের রস ছাঁকিবার বিপুল বস্ত্রখণ্ডটি বুলাইয়া লও! সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাউক! আঃ! আমরা একবার মরিয়া যাই!

এস, আমরা সকলে মিলিয়া মরিয়া যাই। যে যেখানে আছ, স্ত্রীপুরুষ, বালকবালিকা সকলের ঘরবাড়ী ভাঙিয়া নদীতে ডুবাইয়া দিয়া, হাতা-বেড়ী জলে নিক্ষেপ করিয়া, সব কৃতকর্ম্ম কর্ম্মনাশার জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া—এস, আমরা একদিন শ্রাবণের শেষরাত্রে বিলকুল নির্ম্মূল হইয়া মরিয়া, চিহ্নমাত্রে নিরুদ্দেশ হইয়া যাই। কেহ শোক করিবার না থাকুক, কেহ সান্ত্বনা দিবার না থাকুক, সংবাদপত্র ও তাহার খবর পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাউক—বিরাট্ তুহিন-স্তূপ যেখানে বিগলিত-কলেবরে মহানন্দে তরঙ্গ ঝুলাইয়া চলিয়াছে, সেই উত্তরসমুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া—বিন্ধ্য-আন্দিস-ককেশস্-হিমালয়ে, গোবী-সাহারা-আরবে, উজ্জ্বলনীল মার্কিন্ পাম্পাসে, ভারতের শ্যামহরিৎ বনবিস্তারে,—দ্বীপ হইতে দ্বীপে,—অন্তরীপ হইতে অন্তরীপে—সমুদ্র ডিঙাইয়া, পর্ব্বত উৎরাইয়া—শম্ভুর বিরাট্ জনহীনতা এক

শ্রাবণদিনে, কৃষ্ণপক্ষীয় শেষরাত্রে, মানুষের সমস্ত দুর্গ ভাঙিয়া, সমস্ত পরিখা ভরাট্ করিয়া ফেলিয়া আপনার বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া দিক্—সমস্ত অধিকার করিয়া লউক !

পৃথিবীর বিজনতার মধ্যে মানুষ কতটুকু স্থান জুড়িয়া আছে ? ব্রিটিশ ভারতে চন্দননগর !—ততটুকুও নয়। মানুষ তাহার কর্ত্তা-কর্ম্ম-ক্রিয়া-শৃঙ্খলিত ভাষায় কতটুকু আকাশকে মুখরিত করিয়াছে ?—অতি সামান্য ! মানুষদানব পরশুরামের মত কুড়ালি লইয়া, পাগলের মত তাহার চারিদিকে কোপাইতেছে—তবু এই অসীম বিজনতার মধ্যে যদি ইঞ্চিভোর পথ খুঁড়িয়া উঠিতে পারিল ! হে বিরূপাক্ষ, তোমারি সঙ্গী বেতালগণ চারিদিকে পাহারা দিতেছে। উত্তরের আয়ত তুষারাসনে বিপুল শুভ্রকায় তোমার নন্দী স্বস্ত্যয়ন করিতে বসিয়াছে,- সমুদ্রের অতলতায় গুপ্ত থাকিয়া লক্ষলক্ষ যক্ষ নিঃশব্দে প্রবালমুকুতায় ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে, অন্ধকার-গিরিগুহায় বসিয়া কৃষ্ণকায় ভৃঙ্গী আপন-মনে শৃঙ্গবাদন করিতেছে ; মরুভূমিতে তোমারি রক্তচন্দনচর্চ্চিত রক্তচক্ষু পুরোহিত মৌন হইয়া বসিয়া আছে—এবং বনে বনে তোমারি গৌরীর তরুণী সখীগণ চাপল্যে, গীতে, খেলায়, বেদনায়, ঋতুৎসবে নিজ নিজ হৃদয়ের বিচিত্রতা বিকশিত করিতেছে। ইহারি মধ্যে স্থানে স্থানে ইটের উপর ইট তুলিয়া তাহার ফুকরে ফুকরে মানুষ আশ্রয় লইয়াছে ! হে শম্ভু, একটিমাত্র আঙুলের আগায় তোমার ভাঙে-ভিজান বস্ত্রখানি ধরিয়া, তুমি একমুহূর্ত্তে সমস্ত লেপিয়া-মুছিয়া লইতে পার।

একটি প্রান্তরে একটি ভাঙা কুটীর। গৃহস্থ মরিয়া নির্ম্মূল হইয়া

গিয়াছে, এখনো জীর্ণ গৃহটি দাঁড়াইয়া আছে। ভাঙা-ঘরগুলির উপরে ঝড়বৃষ্টি দুর্দ্দমবেগে হানিয়া আসিল! ঐ মেঘলবর্ষা যে তাহার লক্ষ জলতন্ত্রীতে বিদ্যুতের মেরজাপ মারিয়া সেতার বাজাইয়া আসিয়া ধরণীর বুকের মধ্যে প্রবেশ প্রার্থনা করিতেছে—ঐ ভাঙা কুটীরটাই তাহার একমাত্র বাধা। কে ছাড়িয়া গিয়াছে—কা'র স্মৃতি প্রাণে লইয়া এ গৃহ শীর্ণ হইয়া যাইতেছে!—বর্ষা এবং ধরণীর মিলনোৎসুক বক্ষ-দুটির মধ্যে একটা উদ্বেগের মত ঐ ঘরটা দাঁড়াইয়া আছে। উহাকে ভাঙিয়া সমান করিয়া দাও! সেইরূপ, সেই শ্রাবণরাত্রির প্রভাতে মানুষের চিহ্নমাত্র না থাকুক!

আর, ত্রিলোচন একবার মনে করিলে কতক্ষণই বা লাগে! একটি তরঙ্গ-অঙ্গুষ্ঠের আন্দোলনে ইংরাজী, ফরাসী, জর্ম্মাণ—মার্কিনি, জাপানী, রুষিয়ান্—সমস্ত জাহাজ টিপিয়া শেষ করা যায়! ভাঙে-ভিজান বস্ত্রখানিতে একটু কণা শ্মশানভস্ম মাথাইয়া ঘর্ষণ করিয়া দিলে নিউইয়র্কের দশতলা-বারতলা বাড়ীগুলা ধরণীর কলঙ্করেখার মত তখনি মুছিয়া যায়, ধোঁয়াকালীভূষামাখা লণ্ডন, সোনার কালীতে ছাপান একখানি ছবির মত প্যারিস্, ম্যুনিসিপালিটি-গবর্মেণ্টহাউস-সমেত নগরাধম কলিকাতা, বস্ত্রটির কোণে বিন্দুমাত্র কালিমাচিহ্ন রাখিয়া নিঃশেষ হইয়া যায়! শম্ভুদেব, তরুলতিকার বিপুল শ্যামল-স্রোত এই সকল ইষ্টকপুঞ্জের গায়ে আসিয়া ঠেকিয়া ফিরিয়া গেছে—বাধা দূর হইলেই বনলক্ষ্মী দেখিতে দেখিতে ছায়ায়, গন্ধে, মর্ম্মরে, কূজনে-গুঞ্জনে তোমার বিজনগিরিবাসিনী পার্ব্বতীর নিভৃত বিহার-স্থলী রচনা করিয়া দিবে! যাক্,—যাক্,—আবার সমস্ত সোনা-রূপা

মাটির ভিতরে লুকাইয়া পড়ুক ; যাক্,—যাক্,—কঠিন হীরক তাহার কৃষ্ণকায় ভ্রাতা অঙ্গারের সঙ্গে আবার একাসন গ্রহণ করিয়া ধরণী-মাতার বক্ষকোটরে নির্ব্বিশেষে লালিত হৌক্—পৃথিবীর উপরে আর কোন জিনিষের কিছুমাত্র মূল্য না থাকুক। তার পরে মেঘাব-রোধে সমস্ত ধরণী ব্যাপিয়া সুগম্ভীর শ্রাবণনিশা প্রসারিত হৌক এবং বর্ষাধারে সমস্ত ধৌত করিয়া নবারুণরঞ্জিত নবীন প্রভাতটিকে জাগ্রত পৃথিবীর মাথার উপরে পঞ্চাননের পঞ্চমুখের শৃঙ্গধ্বনিতে উদ্বোধিত করিয়া দিক্ !

বিজনতায় ত আমাদের সব লইয়াছে। আদি পিতামহ মনু সেইখানেই গেছেন এবং মনুর শেষতম উত্তরপুরুষও সেইখানকারই যাত্রী—রামচন্দ্র সেইখানেই শরাসন ত্যাগ করিয়াছেন এবং তাঁহার কপি-অক্ষৌহিণীর তুচ্ছতম পুচ্ছধারীটিও সেইখানেই তাহার দুর্দ্দম চাপল্য বিসর্জ্জন দিয়াছে। বিজনতার সহচরী নিদ্রা প্রতিদিন সন্ধ্যার ধূসর পালঙ্কে স্বর্ণাঞ্চল পাতিয়া দিয়া তাহার মদিরাবেশময় বাহুপাশে জনতার আবর্ত্ত হইতে আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে ! তাই, এস,—সেই শ্রাবণরজনীতে ঘুমাইয়া আর যেন না উঠি। বাদলের দিনে যেমন "মেঘের অন্তরপথে অন্ধকার হ'তে অন্ধকারে" দিনটি চলিয়া যায়, এস, সেইরূপ আমরাও সেদিন নিদ্রার আড়াল ধরিয়া মৃত্যুর চিরবিজনতার মধ্যে বিলীন হইয়া যাই। এস সকলে মরি ! মরি—কিন্তু—এ কি, সকলেই যে অবিশ্বাসে হাসিয়া উঠি-তেছে ? যেন আমি কতগুলি বৃথা গর্জ্জন করিলাম !—কেহ বা আমাকে 'হতভাগা' বলিয়া করুণা করিতেছে !—আমি কি বড় দুঃখে

মরিতে চাহিতেছি? তাহা হইলে একা মরাটাই যেন বিবেচনার কাজ—আমি নিতান্ত অবিবেচক নহি। হাঃ! আমার মনের ভাবটা কেহ বুঝিতে পারিল না! তাই ত বলিতে যাইতেছিলাম মরি—কিন্তু—ওইখানেই থামিয়া গেলাম। কিন্তু এবার শোন। মরি, কিন্তু আজ রাত্রে (কল্পনা কর, সেই শ্রাবণের শেষরাত্রি) আমি সেই 'দেয়াগরজনে' মুখর 'শাঙন' রজনীর রাধিকার মত সুখস্বপ্নে অধীর হইয়া বসিয়া আছি! আমি দেখিব না বটে, কিন্তু ভাবিয়া ভাবিয়া মাতিয়া উঠিতেছি—কাল পৃথিবী কি সুন্দররূপ ধরিয়া দেখা দিবে। সমস্ত কলকারখানা, পোষ্টআফিস, জেলখানা, ইস্কুল, আফিস, রেলের রাস্তা সাফ হইয়া গেলে কাল প্রভাতে সমুদ্রপর্ব্বতবনমরুতুষার-বিচিত্রা নবীনা কুমারী পৃথ্বী বৈকুণ্ঠধামের কোন্ দেবনন্দনের প্রণয়-কুতূহলে আপনার নির্জ্জনবাসরে জাগরিত হইয়া উঠিয়া বসিবে! কোথায় গেল প্রকৃতির বাক্‌চেষ্টা বা মিথ্যা মুখরতা! কোথায় গেল প্রকৃতির বোধচেষ্টা বা সহস্র সিদ্ধান্তের আবর্জ্জনা! কোথায় গেল বাগীশ্বর বুদ্ধিমান্ মানুষ! পৃথিবী আবার তাহার মূঢ়তায় সতেজ, তাহার বর্ণবিলাসে স্বাধীন-সুন্দর! ধরণি, ধরণি, কোথায় তুই মাতা? কোথায় তুই লক্ষ সন্তানের পালনবিব্রতা গম্ভীরা অপ্রগল্‌ভা কল্যাণী! আজ তুই তোর কর্ত্তব্যবিব্রত মাতৃজীবন ত্যাগ করিয়া একি প্রগল্‌ভা প্রণয়চঞ্চলার বেশে সাজিয়া বসিয়াছিস্!

ক্ষণিকা।

আজ অনেকদিন হইল রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকা বাহির হইয়াছে। বাস্তবিক পড়িয়া পড়িয়া এতদিনে 'ক্ষণিকা' আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। এখন বোধ হয় এই কাব্য-সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বেশ জোর করিয়া, স্থির করিয়া বলিতে পারিব। প্রথম উদয়ের চক্ষুঝল্‌সানো এখন আর নাই, তাই আশা করি এতদিনে দ্বিধা না করিয়া 'ক্ষণিকা' সম্বন্ধে মন্তব্য বলিতে পারি।

ক্ষণিকার কথাপ্রসঙ্গে একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি একদিন আমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসার মুখে একটু মৃদুহাস্যের নুড়ী নিক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—"হাঁ সুন্দর বটে, কিন্তু সমস্ত কবিতাকে কবি গভীর অর্থযুক্ত করিতে পারেন নাই!" অনেকেরই হয় ত এইরূপ মত। আমাদেরও এ বিশ্বাস নয় যে, ক্ষণিকার যে কোন একটি কবিতা তুলিয়া লইয়া পড়িলেই যথেষ্ট গভীর 'কবিত্ব আস্বাদন করা যায়। যে-কোন-একটি তুলিলে ত হইবে না-ই—যে-কোন-একটি অতি উৎকৃষ্ট কবিতাও পৃথক্ করিয়া লইয়া পড়িলে তাহার সমস্তটা সৌন্দর্য্য জানা যাইবে কিনা সন্দেহ। কদম্বফুলের কেশরগুলি যেমন একটা শরীরে বাণবিদ্ধ থাকাতে, সৌন্দর্য্য-সৌগন্ধপূর্ণ একটি সম্পূর্ণ কদম্ব-ফুল—একটিমাত্র কেশরে অসম্পূর্ণ, ক্ষণিকাও তেমনি সবগুলি কবিতা লইয়া একটি ভাবসুরভি কবিত্বমণ্ডল;—একত্র দেখিলেই ইহার সৌন্দর্য্য,—প্রকৃতি যেমন চিরকালের সহচর, কথনও যায় না, ইহাও তেমনি যাইবে না। কিন্তু যাঁহারা এই একত্বসূত্রটির ঠাহর না পাই-বেন, তাঁহারাই গভীর অর্থের অভাবে নৈরাশ্য প্রকাশ করিবেন।

কিন্তু তাঁহারাও অবশ্য—যদি বাহ্যজগতের কোনো সৌন্দর্য্য-প্রেরণা ধরিবার শক্তি তাঁহাদের অবশিষ্ট থাকে—তাহা হইলে তাঁহারাও ক্ষণিকার ভাষা পড়িয়াই কাঁপিয়া উঠিবেন! একি চমৎকার! এ যে ষ্টাইল!—ঠিক মনের কথা ভাবের ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে ছন্দ বাঁধিয়া অক্লেশ উপমায়, অনায়াস সাজসজ্জায় ছুটিয়া বাহির হইতেছে!

আমরা যতদিন সংস্কৃত দিয়া লিখিব, ততদিন আমাদের ষ্টাইল্ হইবে না। আমরা লিখিবার সময়ে সংস্কৃতের স্থূল ঢাকনীতে আমাদের মনের গতিভঙ্গী আগাগোড়া ঢাকিয়া ফেলি, তাই আমাদের ষ্টাইল্ এত অল্প।

কবিতা মনের কথা, বিশেষতঃ লিরিক্ কবিতা। তাই তাহার ভাষা নিতান্ত সোজা হওয়া দরকার। 'ক্ষণিকা' লিরিকের চরম—উহার ভাষাও তাই একেবারে নিখুঁত সোজা। এই সোজার কত গুণ তাহা দেখা যাইবে।

যে সময়ে আর শিল্পীর কুঁদানো চক্ষে পড়ে না, গঠনটি ঠিক প্রকৃতির ছবির মত প্রাণ ছুঁইয়া দেয়, 'ক্ষণিকা' সেই সময়ের। ভাবে এবং ভাষায় অভেদ। ভাষা কাণে প্রবেশ করিয়া তাহার নিরর্থ তৌর্য্যত্রিকে একমিনিটও দেরী করে না। ঠিক প্রাণে ভাব ও চিত্র নাচাইয়া দেয়—যতটুকু তৌর্য্যত্রিক ভাষাতে রহিয়াছে, ততটুকু ভাব-উদ্বোধনের জন্য আবশ্যক। ইহা হইতে ভাবও যেমন সম্যক্ উদ্বোধিত হয়, তেমনি প্রতি ভাবের সঙ্গে যে একটি মাত্র সুর আছে (যাহা কবিরাই আয়ত্ত করিতে পারেন), সেটিও ধরা পড়িয়া যায়।

"সূর্য্য গেল অস্তপারে
লাগ্‌ল গ্রামের ঘাটে
আমার জীর্ণ তরী—
শেষ বসন্তের সন্ধ্যা হাওয়া
শস্যশূন্য মাঠে
উঠ্‌ল হাহা করি—"

এই লাইন্‌ ক'টি পড়িবামাত্র বুক ছাঁৎ করিয়া উঠে। শব্দ বুঝিবার জন্য একটুও অপেক্ষা করিতে হয় না, ঠিক সেই উদার মাঠের উদাস হাওয়াটা আসিয়া, বুকের উপর হাহা করিয়া উঠিয়া, দূরে ঘুরিয়া চলিয়া যায়।

তার পরে সাজসজ্জা। প্রকৃতি রূপে এবং বর্ণে ভরা। তাহার সুরের সঙ্গে সঙ্গে রূপ অনন্ত। কবিরও যখন সম্পূর্ণতা লাভ হয় তখন তাহার সুরগুলি জমাইয়া রূপের বৈচিত্র্য এবং বর্ণের হিল্লোল চারিদিকে ঘিরিয়া আসে। প্রকৃতি বর্ণনা করিতে গিয়া কবিগণ যে রূপ ও বর্ণ ফুটান, এখানে তাহার কথা হইতেছে না। এখানে রূপ ধরিয়া ভাব প্রকাশের কথা বলিতেছি। ইহাই কাব্যের অলঙ্কার। যেমন :—

"জীবন অস্তে যায় চলি, তাই
রংটি থাকে লেগে
প্রিয়জনের মনের কোণে
শরৎ সন্ধ্যামেঘে"—

এই পংক্তি কটি'তে দূরস্মৃতির ভাবটি শরৎ সন্ধ্যামেঘে একটি

নিবিড়-করুণ রূপ পাইয়াছে বলিতে পারি। এইরূপ অলঙ্কার কবিতার প্রতি পৃষ্ঠায়। এইরূপ অলঙ্কার যেমন ভাষাটিকে ঝুম্‌কা ফুলের ন্যায় বিচিত্র রঙে সাজাইয়া দিয়াছে, সেইরূপ ভাষাটিও কিন্তু আপনাকে নিতান্ত সোজা করিয়া ফেলিয়া অলঙ্কারগুলিকে সহজেই জীবন্ত হইয়া উঠিবার সুযোগ দিয়াছে। ছন্দসম্বন্ধেও সেই কথা। ভাষা অত সহজ, এক একটি পদ অত অল্পাক্ষর বলিয়াই ছন্দগুলি এত বিচিত্র ভঙ্গীপূর্ণ, এমন সহজে ভাবানুসারিণী। অমর-কোষ হইতে স্থূলস্থবির শব্দ বাছিয়া অত নানাভঙ্গীর ছন্দ কে রচিতে পারিত, আমি জানি না।

ছন্দ চাই, সহজ ভাষা চাই, অলঙ্কার চাই—এ সমস্তই লিরি-কের বাহ্যিক উপাদান। কিন্তু এই যে কামিনী-ফুলদলের মত অলঙ্কারগুলি ঝরিয়া পড়িতেছে, ইহার নিগূঢ় কারণ একটি মুক্ত প্রাণের হাওয়া বই আর কিছুই নহে। ক্ষণিকার আদ্যোপান্ত সেই প্রাণটির সন্ধান লইয়া তৃপ্ত হইব।

কাব্যটির নাম 'ক্ষণিকা'। কিন্তু নাম দিয়াই কবি ক্ষান্ত হন নাই। মুখবন্ধস্বরূপ একটি কবিতায় আবার নামটির ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

"ক্ষণিকের গান গা'রে আজি প্রাণ"—
"ধরণীর পরে শিথিল-বাঁধন
ঝলমল প্রাণ করিস্ যাপন।"

এই ঝলমল প্রাণটিই যে ক্ষণিকার আগাগোড়া চলিয়া গিয়াছে—কিরূপে গুরুভারবর্জ্জিত হইয়া প্রথমে যাত্রা করিয়াছে, কিরূপে ক্রমে মুক্তপ্রাণ নানা সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া গিয়া মুক্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে

সুখে বিচরণ করিয়াছে এবং অবশেষে কি একটি গম্ভীর পরম পরিণতি পাইয়াছে, তাহারই অনুধাবন করিয়া কৃতার্থ হইব।

ক্ষণিকা লিরিক। তাই যত কিছু ছবি, সমস্তের মধ্যেই কবির প্রাণটি বিশেষ করিয়া দেখিতে পাই। কালিদাসের কালে লোধ্র-কুরুবক, অশোক-দোহদ শৌরসেনী জল্পনা আপনা আপনি আমাদের কতকটা মোহিত করে বটে, কিন্তু কবির চিত্ত যে সহজেই সেই দূরকালের মধ্যে ঢুকিয়া, সেকালের সমস্ত সৌন্দর্য্য মালার মত গাঁথিয়া তুলিতেছে, এই চলৎকল্পনার লঘুগমনই আরও অধিক চিত্তহারী। ক্ষণিকার গ্রাম্য চিত্রগুলির যে স্বতন্ত্র আনন্দ, তাহা তো আছেই, তাহা ছাড়া সেগুলি যে একরকমে চিত্তভাবের বাস্ত-বায়িত ছায়া বই আর কিছুই নহে—ইহাই আমাদের প্রধানত দেখিবার বিষয়। ক্ষণিকার সেই মূলধারা অর্থাৎ এই কাব্যের আদ্যন্তমধ্যে প্রবাহিত যে কবিজীবনটি, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিতে পারি, ক্ষণিকায় কবিজীবনের একটি সন্ধি ও পরিণতি দেখা যায়। একটি প্রাণ ভোগক্ষুব্ধ যৌবন ছাড়াইয়া ব্যাপ্ত শান্তির স্থির জলে নামিয়া আসিতেছে। ক্ষণিকার যে মোটামুটি দুটি ভাগ আছে, তাহার প্রথম ভাগে প্রাণ কেবল জল্পনা করিতেছে—'আর এ সব বড় কাজ, বড় কথা, সংসারের শূন্য গাম্ভীর্য্য ভালো লাগে না,—সৌন্দর্য্যের সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে মাতাল হইয়া উঠিব,—কাজ আর নহে, কেবল আনন্দ—দুর্দ্দিন পড়িলে ঘরে খিল লাগাইয়া ছন্দগাঁথা কিন্তু আনন্দ পাইলে অগ্নিমুখে পতঙ্গের মত তাহাতে গিয়া ছুটিয়া পড়া। সুখ দুঃখ—যত বুকভাঙ্গা বোঝা সব ঠেলিয়া

ফেলিব।' মোটামুটি প্রথম ভাগে মনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার ভাব—আর শেষভাগে প্রকৃতই সেই সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মাতাল হইয়া উঠা—সেই অনলস আনন্দের জীবন যাপন। সাপের খোলসের মত যেন প্রথম ভাগে, শেষ ভাগের আনন্দচঞ্চল চিত্তের নির্ম্মোক ঝুলিতেছে। প্রথম ভাগে সঙ্কল্প হইতেছে—'তখন খাতা পোড়াও ক্ষ্যাপা কবি' আর শেষ ভাগে 'চতুর রাঙা ঠোঁটে মধুর হাসি' দেখিয়া

'কথাই নাহি জোটে
কণ্ঠ নাহি ফোটে।'

প্রথম ভাগে সঙ্কল্প হইতেছে—কথার ওজন রাখিব না, আর শেষভাগে—

'প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে।'

প্রথম হইতে 'কবির বয়স' পর্য্যন্ত প্রথম ভাগ, 'বিদায়' হইতে দ্বিতীয় ভাগ। কবি বিদায় লইতেছেন। অনেকক্ষণ জল্পনা করিয়া মনটাকে বুঝাইয়াছেন। 'আঁধার আলোয় শাদা কালোয় দিনটা ভালই গেছে কাটি'—কবি বিশ্রামে যাইতেছেন, যুবাদলের আমোদপ্রমোদে আজ তাঁহার যৌবনান্তকালের বিমনস্কতা উপস্থিত। প্রাণটি আজ আর ভোগে বদ্ধ নাই, আজ তাহার কোন তীব্র লোভ নাই, কিন্তু সৌন্দর্য্যের কণামাত্র আভাসেই বিকল হইয়া উঠিতেছে—'পড়ল খসে খসে।' প্রাণ বিশ্বে ছড়াইয়া গিয়াছে—সে আজ উদাসীন। একদিন যৌবনের মত্ততায় অকূলে যাত্রা হইত, রশারশি ছিঁড়িয়া ছুটিয়া যাইতে হইত, কিন্তু এখন আর সে তীব্র আবেগ নাই; সে তীব্র যৌবন,—'জীবনের

সেই পরম অধ্যায়' চম্পকবকুলচামেলীভারে নিজেকে মণ্ডিত করিয়া মুহুর্মুহু উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাসে আপনাকে মাধবীর গূঢ় সত্তার সঙ্গে অনন্ত-আবর্ত্তন-মুখে বিদায় করিয়া দিয়া আসিয়াছে—

"অমর বেদনা মোর হে বসন্ত রহি গেল তব
মর্ম্মর নিশ্বাসে
উত্তপ্ত যৌবন-মোহ রক্তরৌদ্রে রহিল রঞ্জিত
চৈত্র সন্ধ্যাকাশে।" (কল্পনা)

এবার আর যৌবনের সেই তীব্র বেদনা সহিবে না—

'এবার ঘুমো কূলের কোলে
বটের ছায়াতলে
ঘাটের পাশে রহি'
ঘটের ঘায়ে যেটুকু ঢেউ
উঠে তটের জলে
তারি আঘাত সহি।'

'যাস্‌রে খেয়া বেয়ে
আন্‌বে বহি গ্রামের বোঝা
ক্ষুদ্র ভারে ভারে
পাড়ার ছেলে মেয়ে।'

কবি আসিয়া যেন নিতান্ত সরল সৌন্দর্য্যের মধ্যে গ্রামের প্রান্তে ঘর পাতিয়াছেন।

"আজ শান্ত তীরে তীরে
তোমায় বাইব ধীরে ধীরে।"

খঞ্জনা নদীর তীরে অঞ্জনা গ্রামখানি। সে গ্রামে শরৎ ও বর্ষা ঋতুতে কবির বাস। কবি সেখানে অকাজে যখন-তখন যেখানে-সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, লক্ষ্য কিছু নাই বলিয়াই প্রতি মুহূর্ত্ত তাহার সৌন্দর্য্য-সম্পদ্ কবির প্রাণে অজস্র ঢালিয়া দিতেছে—

দীঘির জলে ঝলক্ ঝলে
মাণিক্ হীরা
সর্ষে-ক্ষেতে উঠ্ছে মেতে
মৌমাছিরা।
এ পথ গেছে কত গাঁয়ে
কত গাছের ছায়ে ছায়ে
কত মাঠের গায়ে গায়ে
কত বনে
আমি শুধু হেথায় এলাম
অকারণে।

কখনও মাঠে, কখনও ঘাটে—রাস্তা যেখানে গিয়াছে, কবি সেখানেই যাইতেছেন। কখনো কখনো মনটিকে একটু ঘুরাইয়া সেই দূর বৃন্দাবনের দিকে ফেলিয়া, হৃদয়ের জালে সেকালের সখাদের সমস্ত মধুর লীলা তুলিয়া আনিতেছেন, প্রতি শব্দে পাঠককে বৃন্দাবনে লইয়া যাইতেছেন। কাল ও দেশের ব্যবধান কোন সৌন্দর্য্যকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না। হৃদয় এত লঘুভার যে, সে 'রিমিঝিমি বাদল বরিষণে' রাতে স্বপ্নের সঙ্গেও সত্যের মত করিয়া সম্ভাষণ করিতে চায়। কবির কাছে সত্য এত গুরুত্ববর্জ্জিত হইয়াছে যে,

স্বপ্ন হইতে যেন তাহার কিছু তফাৎ নাই। এমনি তরল প্রাণ বলিয়া তাহার প্রসারও অনেক—অনেক দূর—একটুখানি উত্তেজনা হইলেই সে বাণিজ্যে ছুটিয়া যায়—

"নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ
প্রবাল দিয়ে ঘেরা
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে
সাগরবিহঙ্গেরা।
নারিকেলের শাখে শাখে
ঝোড়ো হাওয়া কেবল ডাকে।"

এইরূপ ভারশূন্য প্রাণে কবি আসিয়া গ্রামে বাসা করিয়াছেন। যেখানে-সেখানে অকারণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সন্ধ্যায় বধূর দ্বারে অতিথি হইয়া রিণিঠিনি শিকলটি নাড়িয়া দিতেছেন,—মাঠের মেঘ-ত্রস্তা হরিণ-চোখ মেয়েটিকে কৃষ্ণকলি বলিয়া অভিহিত করিতেছেন,—জলার্থিনী দুটি বোনের গুঞ্জনধ্বনি দূর হইতে শুনিতেছেন,—'ভাঙনধরা কূলে' আপনারি অন্তরের সৌন্দর্য্যতৃপ্তিকে মূর্ত্তিমতী দেখিতেছেন,—

"আজকে এমন বিজন প্রাতে
আর কারে কি চাই?
সে কহিল ভাই,
নাই নাই নাই গো আমার
কারেও কাজ নাই।"

কখনো 'সজলনীলজলদবরণবসনাবৃতা'র জন্য স্থান করিয়া দেওয়া

হইতেছে। মোট কথা 'শরৎকালের বালুচরে নির্জ্জন ঘর' হইতে, কখনো স্থলপথে, কখনো জলপথে বাহির হইয়া কবি বাংলা গ্রামের সমস্ত সৌন্দর্য্যের সম্মুখেই আপনাকে আনিয়া ফেলিতেছেন—এ কেবল স্বচ্ছ হৃদয়ে সৌন্দর্য্যের ছাপ ধরা। হৃদয়ে আলোড়ন থাকিলে এই কোমল সৌন্দর্য্যগুলি এমন যথাযথ বেশে উঠিয়া আসিতই না।

সৌন্দর্য্যের সঙ্গে কেবলমাত্র দেখা এবং স্পর্শ বিনাই তাহার আভাটি হৃদয়ে লওয়া। তাই যাত্রীকে কেবলমাত্র পার করিয়াই সুখ—কোন পীড়াপীড়ি, কোন নাছোড় জিজ্ঞাসাবাদ নাই—

বল্‌তে যদি না চাও, তবে,
শুনে আমার কি ফল হবে?

কোন ব্যস্ততা নাই। দুজনে একটি গাঁয়ে থাকিয়াই সুখ। প্রাণ সৌন্দর্য্যের উপরে আপনাকে বিশ্বময় ছড়াইয়া প্রতি ক্ষুদ্র কণায় বৃহৎ সুখকে, দূরের সুখকে অধিকার করিতেছে—

"তাদের বনে ঝরে শ্রাবণধারা
মোদের বনে কুসুম ফুটে ওঠে।"

একটি যে দূরবিস্তারী "গোপন মনের মিলন ভুবনে ভুবনে আছে"—প্রকৃতির কবি আজ প্রাণে প্রকৃতির সেই মিলনাধার ঔদার্য্যটি লাভ করিয়াছেন। যেখানে 'বিরহ,' সেখানেও আবেগ ব্যাপ্ততায় শান্ত হইয়া গিয়াছে। দুপরে ঝাউয়ের অবিরাম শব্দে ক্ষণকালের জন্য সমস্ত আকাশ বিরহবাঁশীর সুরে কাতর—আবেগ আর হৃদয়ের সঙ্কীর্ণ কোটরে জ্বলিয়া মানুষটিকে বিক্ষিপ্ত করিতেছে না, শুভ্র

অলস মেঘজড়ানো আকাশ, নিস্তরঙ্গ নদী—সমস্ত প্রকৃতিকে জড়াইয়া পড়িয়া আছে।

মিলনে আহ্বান—সেও কি অতীব্র সুরে!—

এস তোমার চরণ ছুটি
তৃণের পরে ফেলে।

আর মিলন তো নিতান্তই 'সোজাসুজি'। সোজাসুজি বলিয়াই ছোট নহে, পরন্তু অতি বৃহৎ, মনোরম উচ্ছ্বাস—

ছুটি চক্ষে বাজবে তোমার
নব রাগের বাঁশী
কণ্ঠে তোমার উচ্ছ্বসিয়া
উঠবে হাসিরাশি।

অতর্কিতে কোন দিন দুর্দ্দিনে সুন্দরী ফুল নিতে আসিয়া পড়িলেও কোন শশব্যস্ততা নাই। মনে পড়ে বটে একদিন ছিল,

'বন আলো করি ফুটে ছিল যবে
রজনীগন্ধারাজি,—'

কিন্তু অচিরেই সে খেদ পরিহার করিয়া 'ছিন্ন কুসুম পঙ্কে মলিন ধুয়ে ধুয়ে' দেওয়া হয়। এক একদিন 'মনের কথা জাগানে' বাতাস বহিলে আগের কথা মনে পড়িয়া প্রাণের তল হইতে বেদনা মর্ম্মরিত হইয়া উঠিতে চায়, কিন্তু—'আজকে কিছুই গাব না'—কবি সহজেই আপনাকে সংবরণ করিয়া ফেলেন।

তাই দেখিতেছি শান্তি, ব্যাপ্তি—দেখিতেছি অসীমে প্রসার। প্রথম ভাগে কবি তীব্র ভোগাকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়া আসিয়াছেন,—ক্রমে

দেখিতে পাই, মিলন, বিরহ, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি প্রাণটিকে আদৌ ধরিতে পারিতেছে না, তাহাদের মধ্য হইতে 'সূত্রং মৃণালাদিব' সৌন্দর্য্যটুকু লইয়া, আনন্দরসটুকু লইয়া প্রাণ কোথায় ছুটিয়া যাইতেছে। সুখ দুঃখ ত পাতার ভেলার খেলার মত, প্রেমও নিতান্ত সহজ—এ সব ছাড়াইয়াও কবি কোথায় যাইতেছেন? তাঁহার উদার প্রাণ কাহাকে অবলম্বন করিয়া আপনাকে সম্পূর্ণ ব্যয় করিয়া দিতে পারে? উত্তর—প্রকৃতিকে। পূর্ব্বে যে সুর শুনিয়াছিলাম 'অকূল শান্তি সেথায় বিপুল বিরতি' এখন তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। মাধুর্য্যে কবি আজ ধনী তিনি আজ কৃতার্থ, তিনি আজ দাতা, সকলকেই তাঁহার কিছু দিবার আছে—

"আছে আছে কিছু রয়েছে বাকী।"

প্রকৃতির বুকেই যেন তাঁহার স্থির শান্তির ঘর তৈয়ার হইয়া গিয়াছে। কবিও তাহা ছবিতে এবং সিধা কথায়ও বলিয়া দিতে বাকী রাখেন নাই। "ভর্ৎসনা" কবিতায় কবি বলিতেছেন—"আমাকে তিরস্কার করিও না। আমি বিনা স্পর্শে তোমার সৌন্দর্য্য লইয়াছি, আমি কাহারো জন্য অপেক্ষা করিয়া নাই—আমার গৃহ আছে—সেখানে

"জ্বলে প্রদীপ ধ্রুব তারার মত"।

আবার সিধা কথাতেই বলিতেছেন—

"দূরে দূরে আজ ভ্রমিতেছি আমি"—

"তাই ত্রিভুবন ফিরিছে আমার পিছুতে"।

স্থির শান্তির ঘর রচিত হইয়া গিয়াছে। তাই যতই শেষের দিকে

যাই, ততই প্রাণ মেঘমুক্ত, ততই প্রাণ আপনার ঔদার্য্যপরিমাণ বিহারভূমিতে আসিয়া পড়িতেছে,—শেষের দিকে যতই যাই, ততই সেই 'বিপুল বিরতি', সেই 'অকূল শান্তির' সম্মুখে আসিয়া পড়িতেছি। প্রভাতে কবির প্রাণটি বর্ষাধৌত প্রকৃতির উপর পড়িয়া ঝিকি ঝিকি করিয়া কাঁপিতেছে, সংসারের আচারকে অবহেলা করিয়া বর্ষার ঝর্ঝরের সঙ্গে মাতিয়া উঠিতেছে—নব বর্ষার নানা রঙের অন্ধকারে নানা রঙীন্ ভাবের জাল প্রাণের চারিদিকে ময়ূরের পাখার মত খুলিয়া যাইতেছে, বিশ্বের সৌন্দর্য্য বুকের মধ্যে আসিতেছে, আবার প্রাণের ভাব বিশ্বে বাস্তবায়িত হইয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। যেমন :—

"নয়নে আমার সজল মেঘের নীল অঞ্জন লেগেছে।
নব তৃণ দলে ঘন নব ছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে
পুলকিত নীপনিকুঞ্জে আজি
বিকশিত প্রাণ জেগেছে।" • •

প্রকৃতিও নদীকূলে, কেতকীতটে, মেঘপ্রাসাদে, বকুলশাখার অন্ধকারে, অনতিস্ফুট বিভাসে নিজের মূর্ত্তিখানি দেখাইয়া পালাইতেছে। একজন চিত্রকর যদি এই ছায়াভাসগুলিকে অমর ব্যঞ্জনের বর্ণে ফুটাইতে পারিতেন। এত তন্ময়তা, এত সৌন্দর্য্য, এত বিস্তার, এত সুসঙ্গত সঙ্গীত যদি সর্ব্বোৎকৃষ্ট লিরিক্ সৃষ্টি না করিতে পারে, তবে জগতে আর পূর্ণ লিরিক্ নাই।

এইরূপে সঙ্গীতের মাতালের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপ্তক্ষেত্রে আসিয়া

আমরা বহির্ভুবনের উপর গলিয়া পড়িয়াছি, কিন্তু অবশেষে আরও একটি নিবিড়তর স্পর্শে আমরা অতলের অতলে ডুবিয়া গিয়াছি। প্রকৃতির মধ্যে এতকালের আরাধ্যা আবির্ভূতা হইলেন, প্রাণ আনন্দে ভাঙিয়া-চুরিয়া ভাসিয়া গেল, কোনদিকে আর তীরের সন্ধান পাইল না।

"আমার পরাণে যে গান বাজাবে
সে গান তোমার কর সায়
আজি জলভরা বরষায়।"
"যেথা চলিয়াছ সেথা পিছে পিছে
স্তবগান তব আপনি ধ্বনিছে।"

কবির বীণা নীরব হইয়া রহিল।

ক্ষণিকায় সৌন্দর্য্যের সাধনা সম্পূর্ণ হইয়াছে। ক্ষণিকা একখানি সাধনার ইতিহাস, সৌন্দর্য্যসাধনা ও মাধুর্য্যসাধনার ইতিহাস অর্থাৎ পরম কবিতা, কবিদের আপনাদের জিনিষ। কবি সংসার হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সৌন্দর্য্যের সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, সাধনা সফল হইয়াছে। তাই কবি সংসারের জন্য একটি আলয় নির্ম্মাণ করিতে-ছেন—তাঁহার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের আদর্শস্বরূপা এই কল্যাণী।—কবির "সর্ব্বশেষের গানটি" সিদ্ধকাম কবিকে আবার সংসারের সহিত মিলাইয়া দিতেছে।

ক্ষণিকায় আরও দুইটি কবিতা আছে। সুগম্ভীর দুটি কবিতা। সেই দুটি পড়িলেই আমরা বুঝিতে পারিব, তুমুল ছন্দে কাহার আবির্ভাব হইয়াছিল। এইখানেই আমরা অতলের অতলে ডুবিয়া

যাই। চঞ্চল হইতে গভীর সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া বাংলার প্রকৃতির বনপথ দিয়া একটি কবির প্রাণ আসিয়া অবশেষে এক "স্তব্ধ উদার আলয়ে নীরব নিভৃত ভবনে" উপস্থিত হইয়াছে। এখনো

"চিহ্ন কি আছে শ্রান্ত নয়নে
অশ্রুজলের রেখা?"

বাংলাও ধন্য, আমরাও ধন্য। যতই সংসারের ভার বাড়িবে, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অত্যাচারে আমাদের জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিবে, ততই এই পরিপূর্ণ কোমল মাধুর্য্যের বিবরণ সর্ব্বদাই আমাদিগকে অসীম এবং সুন্দরের সহিত অন্তত কণাতেও সংশ্লিষ্ট রাখিবে। যাহারা এইরূপ সুন্দর হইতে জানে এবং মানুষের জীবনের নিগূঢ় মধুর রস নিজের প্রাণে পাইয়াছে, তাহারাই যেন আপনার কথা গান করে, তাহারাই যেন লিরিক্ কবিতা লেখে। কারণ ঐ একটি হৃদয়ের জ্যোতিঃসম্পদে সমস্ত মনুষ্যজাতির গৌরব।

ক্ষণিকার আলোচনা করিলাম। আসল কাব্যপাঠের যে আনন্দ, তাহার শতাংশের একাংশও বলা হইল না। যাহারা ক্ষণিকা পড়িয়াছেন, তাঁহারাই এ কথা বুঝিবেন। ক্ষণিকার আলোচনা করিলাম সত্য, কিন্তু প্রসঙ্গতঃ একটু এদিক্ ওদিক্ একটু আগেপাছে দৃষ্টি দেওয়া অনিবার্য্য। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন ধারাবাহিক। স্তরে স্তরে তাঁহার কাব্যের বিকাশ—কোনোখানে একটা উড়িয়া-আসা উদ্ভট কবিতা পাওয়া দুষ্কর। তাই একখানি কাব্যের সূত্রেই স্বভাবত আমরা তাঁহার অন্যান্য কাব্যে গিয়া উপস্থিত হই। ক্ষণিকা হইতে পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি—কি আলোড়ন, কি বেদনা, কি একটা অশান্ত

অন্বেষণ। সেই 'তলতল ছলছল' ইত্যাদি আহ্বানের গভীর আবেগ;—সেই 'ভীষণ রঙ্গে ভবতরঙ্গে ভাসাই ভেলা রাত্রিবেলা' ইত্যাদি অতিমাধুর্য্যের অবসাদান্তে উন্মত্ত মিলন;—সেই ধরণীগগনের সৌন্দর্য্যকে ব্যথিত হৃদয়ের বেষ্টনে মানসী প্রেয়সীর রূপে আহরণ করিয়া লইবার চেষ্টা,—যেমন 'মানসসুন্দরীতে'; আবার সেই রমণীকে সমস্ত সম্বন্ধ, কর্ত্তব্য-বন্ধন হইতে ছাড়াইয়া বিশ্বভুবনের অঙ্গে তাহাকে বিস্তারিত করিয়া দেওয়া—যেমন উর্ব্বশীতে; সেই 'যেতে নাহি দিব' স্বরে বুক চিরিয়া পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া ক্রন্দন; সেই চিত্রাঙ্গদার পার্ব্বতীয় অরণ্যচ্ছায়ে দীর্ঘায়িত প্রেমলীলা—আরও সেই কত ঢেউয়ের টলমলানি, কত স্রোতের টান যে দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে কি একটা কৃচ্ছ্র আলোড়নই দেখিতে পাই! তাহার পরে ক্ষণিকায় আজ সৌন্দর্য্য সহজ হইয়া আসিয়াছে 'নাগাল পেয়েছি নীচুতে'! চৈতালীতে যে একটা শান্তি আছে, সেটা গভীর শান্তি নহে, সে বিকাল-বেলার শান্তির মত—তখনো সৌন্দর্য্যের সঙ্গে প্রাণ একেবারে নিবিড় মাখামাখি ভাবে মিশিয়া যায় নাই; কিন্তু ক্ষণিকায় একেবারে মিলন, "অকূল শান্তি সেথায় বিপুল বিরতি।"—ক্ষণিকায় যে শান্তি, তাহা নিতান্ত নিবিড় রহস্যময় মধ্যরজনীর শান্তি।

ক্ষণিকা হইতে এখন আবার আমরা কোথায় যাইব? রবীন্দ্রনাথ যাহা আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহার জন্য তো আমরা নিতান্ত কৃতজ্ঞ, কিন্তু আরো কি সম্মুখে চাহিতে পারি না? ওয়াল্‌ট্ হুইট্‌ম্যান্ Passage to India বা 'ভারতযাত্রা' নামক কবিতায় আত্মার সঙ্গে সমুদ্রে বাহির হইয়া ভারতের তীরে উপস্থিত হইয়া যেমন বলিতেছেন—

"Passage to more than India, O soul."

আরো দূর, ওরে প্রাণ ভারত ছাড়িয়া—

তেমনি কণিকায় দাঁড়াইয়া আমরা কি "আরো দূরের" সঙ্গীতের, আরো বৃহৎ গভীর গুহার প্রত্যাশা করিব না ?

মেঘচ্ছবি।

আমাদের প্রান্তরে মেঘবৃষ্টির ক্রীড়া আরম্ভ হইয়াছে। এই প্রান্তরই বটে শৃঙ্খলমুক্ত বর্ষা-প্রকৃতির সুযোগ্য ক্রীড়াঙ্গন। মুক্ত আকাশ এবং মুক্ত প্রান্তর মুখোমুখী হইয়া চাহিয়া থাকে ; তরুলেখা-শূন্য চক্রবালে, যেখানে মৃত্তিকা অসীম আকাশসমুদ্রের প্রান্তে স্তম্ভিত হইয়া যেন থামিয়া দাঁড়াইয়াছে, দৃশ্যপটের সেই দুরান্ত সীমায়,—শূন্যতার অবাধ বিস্তারে এক অগাধ এবং কঠোর ঔদাসীন্য ব্যঞ্জিত দেখিতে পাই ; আর এক দিকে, যেখানে ধরণী-আকাশের সঙ্গম-রেখায় এই সুদূর হইতে লক্ষ্যগোচর একসারি চিত্রবৎ স্পন্দহীন তাল গাছ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ওই অগাধশূন্যতাকে প্রতিহত করিতেছে, ওখানকার দৃশ্যটি কি সকরুণ! ঐ দূরলক্ষ্য ক্ষীণ তালগাছ-ক'টি দেখিয়া আমার মনে কেমন-একটু অসহায়তার ভাবের সঙ্গে একটি করুণা আবির্ভূত হয়। বিশ্বগ্রাসী শূন্যতার মধ্যে ওই ঋজুক্ষীণ জীবনরেখা-কয়েকটি বাস্তবিকই বড় সকরুণ।

কিন্তু চারিদিকেই, ঔদাসীন্য এবং কারুণ্যে সকলি ভরিয়া আজ ব্যাকুলতার নিবিড় সঞ্চার। ঐ যে তালীশ্রেণীর পশ্চাতে ঘন-নিবদ্ধ মেঘস্তর বিলম্বিত হইয়া তালীবনশ্রেণীতে কৃষ্ণকোমল সজলস্পর্শে গভীরতর কারুণ্য অর্পণ করিয়াছে। এবং পশ্চিম দিগন্তেও ঐ নির্লিপ্ত শূন্যতার অন্তর আজ বৃহৎ বাষ্পোচ্ছ্বাসতরঙ্গে গদ্গদ এবং ব্যাকুল।

আমাদের ধরাতলের বাষ্পোচ্ছ্বাসে বুঝি আজ গগনের জ্যোতি-

র্লোক অবরুদ্ধ; দীর্ঘায়িত গুরু গুরু মেঘধ্বনিতে বুঝি আজ পৃথিবীর মর্ম্মবেদনা আকাশপ্রাঙ্গণে শব্দায়মান। শূন্যতার উদাসীন ললাটে চিন্তাকালিমা, জ্যোতির্ম্ময় স্বর্লোক নিরুদ্ধ, আকাশপ্রাঙ্গণে সিন্ধুনির্ঘোষ, ধরণীর বনে প্রান্তরে নিবিড়তর মলিনিমা—আজ ধরণীগগনের সহানুভূতির দিন, আজ অপেক্ষার দিন, আজ অশ্রু-জলে মিলনের দিন, আজিকার দিনান্তের পরিব্যাপ্ত অন্ধকারে ধরাতলে অভিসারের এক রজনী আবির্ভূত হইবে।

কোথা হইতে কোথা চলিলাম? কিন্তু আজিকার দিনে সহজেই রাত্রির কথা মনে পড়ে। দিন আজ রাত্রির মত প্রায়, সমস্ত সুখ আজ দুঃখের মত প্রায়। নীপসুন্দরস্মিতাসুন্দরি, তোমার হাসি আজ সিন্ধুতলের রত্নের মত অন্ধকার। স্মরচাপ-ভ্রূ-বিলসিতা, তোমার উজ্জ্বল চক্ষুতারকা আজ ঘনঘোর আকাশের মত বাষ্পময় অন্ধকারে আবিষ্ট। কোথায় রাত্রি? কোথায় রাত্রিমুখে সন্ধ্যা? আজ কিরূপে তাহাকে চিনিয়া লইব? তাহার নীলাকাশভরা কোমলতা হইতে নীলাভার বিগলিত হইয়া আজ কখন্ কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইবে! ঘনবিন্যস্ত মেঘের রন্ধ্রে কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইব কি? কিন্তু না,—আজিকার সন্ধ্যা অপূর্ব্বতর। এ কি অভিনব সন্ধ্যা। বিকচজবাপুষ্পরাগরক্ত এই সায়াহ্নকাল। ক্ষণকালের জন্য একটি রক্তমেঘ হইতে কোমলতর রক্তাভা নির্গত হইয়া এমনি তীব্র উজ্জ্বলতা ধারণ করিল যে, মনে হইতেছে, যেন বিশ্বকর্ম্মার অগ্নিকুণ্ডে দেবসেনাপতির বহ্নিদগ্ধ কঠিন লৌহবর্শা নির্ম্মাণ হইতেছে। রক্তাভার নিম্নদেশে পৃথিবীও একটি বনচ্ছবি মিলাইয়া দিল, বৃষ্টিধৌত মেঘচ্ছায়া-

চকিত নিবাত-নিষ্কম্প বনচ্ছবি এমনি প্রগাঢ় সবুজ যে, ঐ ছবিটিকেও যেন কার্ত্তিকেয়ের একটি কঠিন তাম্রচালের উপরে উৎকীর্ণ বলিয়াই মনে হইতেছে। মেঘে এবং বনে মিলিয়া একখানি রক্ত-পীত-নীল-হরিত-তরঙ্গায়িত প্রগাঢ়বর্ণ তাম্রপত্রে খচিত বৃহৎ ছবি।

এই চিত্রখানির, এই প্রতিমাখানির বেদিকা—এই অপার মুক্ত-প্রান্তর,—এই ছায়ামলিন সিক্ত-সুগন্ধি তৃণক্ষেত্র। ধীরে ধীরে সিক্ত মাঠের প্রতি অণুটিতে সন্ধ্যারাগ প্রবেশ করিয়াছে। কোথাও কালো ছায়া পড়িয়া রহিয়াছে। ক্ষেতের স্থানে স্থানে বর্ষার জলরাশি সঞ্চিত হইয়া আছে। ঐখানেই আকাশের বর্ণে ভূবেদিকা অতিশয় সুরঞ্জিত। ঐ যে বাঁধের বর্ষাস্ফীত তীর-তরুমূলচুম্বিত জলরাশি দেখিতে দেখিতে সমস্ত অবয়বে সিন্দূর হইয়া উঠিয়াছে, কোথাও বা জলকান্তি জম্বুরস-কষায়িতবৎ ঈষৎ বেগুনী। ধরণী-গগনের সহানুভূতির মধ্যে, পরস্পরের সিন্দূরী অনুরঞ্জনের মধ্যে বসিয়া মনে হইতেছে যেন আমার চারিদিকে নানাবর্ণদন্তুর একটি বিরাট দাড়িম ফল ফাটিয়া ভাঙিয়া পড়িয়াছে—চারিদিকেই এই স্বচ্ছতা, সরসতা এবং বর্ণবিন্যাস। আজ আমার স্তম্ভিত দুঃখিত হৃদয়। তাহা না হইলে চিত্তপটে এই মেঘচ্ছবি বিম্বিত হইয়া, শত উপমায় জীবন্ত হইয়া এক অলকাপুরী নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিত। তাহা হইল না,—সন্ধ্যার ছায়ায় আমার অদৃপ্ত বীণা পদতলে ফেলিয়া দিয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছি। সিন্দূররেখা ক্রমে ম্লানিমায় বিলীন হইয়া যাইতেছে।

ডায়ারী।

ডায়ারী।

১৩০৯, ১৩ই বৈশাখ।

আপনাকে পাইতে হইবে। আপনাকে না পাইলে জীবন মিথ্যা। আমি কুলক্রমাগত সংস্কারের, সমাজের দাস হইয়া মূর্খের মত কেন ফিরিব? আমি পরের উপদিষ্ট এক অগম্য অনমুভূত কাল্পনিক ঈশ্বরকে ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া আত্মার ধার কেন কুণ্ঠিত করিব? আমি আপনাকে জানিব। আপনি যতটুকু ঈশ্বরকে পাইব ততটুকুই জীবন কৃতার্থ হইবে। আমার প্রাণের প্রাণ, আমার জীবনের চালক প্রতিমুহূর্ত্তে জাগিয়া থাকুন। মাঝে কেউ নাই, তাঁরি পদতলে একা আমি বসিয়া থাকিব, গুন্ গুন্ করিয়া হৃদয়ের ভিতরের সমস্ত খুলিয়া বাহির করিয়া তাঁহার পায়ে দিব। কোন মানুষের কাছে আমার কোন জবাবদিহি নাই। আপনাকে মিথ্যার জালে কেন জড়াইতে যাইব। যে দেবতা আমাকে এত বড় করিয়াছেন এত সুখ শান্তি সৌন্দর্য্য দিয়াছেন, তিনি আমাকে রক্ষা করুন। আমার অন্তরের সত্যকথাগুলিই বলিব—অন্তরদেবতার কাছে বলিব। আমি আবেগের সহিত তাঁহাকে অনুভব করি—তিনি আছেন।—তিনি

আর কেউ নন, তিনি আমার জীবনের উদ্দেশ্য। যে উদ্দেশ্যে আমি জগতের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছি। এই সুন্দর বৃহৎ জগতের মধ্যে কেন জন্মিলাম? অবশ্য এ জীবনের এক মহান্ উদ্দেশ্য আছে। দেবতা, আমার জীবনের মহত্ত্ব যেন কখনো না ভুলি, আপনার আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে যেন জড়ত্বের গোলে পড়িয়া কখনো উপহাস না করি। আমার ঈশ্বরকে আমি পাইব। কারণ এই অল্পদিনের মধ্যেই প্রকৃত আনন্দের কিছু কিছু আস্বাদ পাইয়াছি।—প্রকৃতি তাহার সন্ধ্যার তামসীবর্ণে চান্দ্রমসীবর্ণে কি শান্তিই প্রাণে বর্ষণ করিয়াছে! মধ্যাহ্নের আকাশে রৌদ্র হোমাগ্নি জ্বালিয়া কি রসই প্রাণে সঞ্চার করিয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরের স্পর্শ কখনই মানুষের স্নেহের ভিতর দিয়া ছাড়া প্রাণে পড়িতে পারে না। আমি ভাবিয়া দেখি এই যে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য আমাকে মাতাল করে এর মূলে কি? প্রাণের অনুভব করিবার শক্তি হইল কি করিয়া? মানুষের ভালবাসায়।

জানি না, পিতৃমাতৃহীন শিশুর উপরে প্রকৃতিমাতা কোন প্রভাব বিস্তার করেন কিনা—বোধ হয় করেন, কিন্তু আমার ত মনে হয় (আমার জীবনে যেরূপ দেখিয়াছি) ছেলেবেলায় বাপমার কাছে সুকোমল স্নেহের মধ্যে পালিত হইলেই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য প্রাণের উপর পড়িতে পারে। জীবন্ত মানুষের ভালবাসাই সেই ইন্দ্রজাল যাহাতে জীবনের ছায়ানাট্য এত বিচিত্রভাবে চলিতেছে।

সে ভালবাসা আমি পাইয়াছি। ঈশ্বরকেও আমি পাইব। অসীম শান্তিকেও আমি পাইব। অন্তরদেবতার কাছে জীবনের ভিতর খুলিয়া

বলিব, তাহাতে আমার চক্ষেও জীবনটি ফুটিয়া উঠিবে—জীবনের সুর আমার কানেও বাজিয়া উঠিবে। আজকাল মনে হইতেছে যেন একটি সুরের কাছাকাছি আসিয়াছি। কিন্তু এখনো আমার জীবনে অনেক মিথ্যা আছে। বিদ্যার ভাণ বোধ হয় তার মধ্যে প্রধান। যতই মিথ্যা দূর হইবে ততই জীবনের সুর ফুটিয়া উঠিবে।

গুরুদেব বলিয়াছেন আত্মালোচনা করিতে গিয়া morbid হয়ে পোড়ো না। morbid কেন হইব? আমার স্বাস্থ্য কি এতই খারাপ? আমার সহজ আনন্দকে কেন দমাইতে যাইব? কেন morbid হইব? জীবনের রস কি আমি কিছুমাত্র পাই নাই? হায়! প্রতিদিন আমি কি-একটি সৌন্দর্য্যের কাছে আসিতেছি! প্রতিদিন আমি কেমন চেতনা লাভ করিতেছি। কেমন সত্যের মধ্যে জাগিতেছি! ইহার আনন্দ আমি দমন করিতে পারি না। গুরুদেবের স্নেহই ত আমার জীবনের উপর সূর্য্যরশ্মির মত পড়িয়াছে। তাঁহার সেই অপরাজিতা ফুলের মত কোমলতাপূর্ণ চক্ষুদুটি আমার হৃদয়ের ভিতরের সহস্রদল পদ্মের উপর স্থাপিত হইয়াছে। আমার প্রাণে মনে ভাবে কল্পনায় সংসারে—সর্ব্বত্র তাঁহার স্নেহকিরণ পড়িয়াছে। ফুলের উপরে প্রভাতের সূর্য্যরশ্মি পড়িলে সে যাহা অনুভব করে তাহা আমি একটু একটু যেন বুঝিতে পারি। Rudel to the Lady of Tripoli নামক Browning-এর কবিতা আমি বুঝিতে পারি। যদি আমার কণ্ঠে সুর থাকিত তবে ধীরে ধীরে সেই অনুভবের গানটি একবার গাইতাম—সুরের মধ্যে উষার বিমলতা কোমলতামাখা মৃদুসুরভি নিশ্বাস বহিত। এই স্নেহ পাইয়াও আমি কেন

morbid হইব ? morbid হইবার কোন কথাই নাই। আমি কি করিয়া যে এই স্নেহরশ্মির নীচে বহিয়া আসিলাম—শুধু সেই কথাটি ভাবিয়া দেখিলেই ত সমস্ত morbid ভাব দূর হইয়া যায়। জীবনের অন্তরে একটা অদ্ভুত ইন্দ্রজালের আভাস পাইয়া হৃদয় বিস্ময়ে ভরিয়া যায়!

জীবনের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতেছে। এই বিরাট বোলপুরের মাঠ, রৌদ্রে অগ্নিতেজ বুঝাইয়া দেয়, সবিতার তেজ বুঝাইয়া দেয়, ঝড়ে বায়ুর শক্তি প্রকাশ করে, মেঘে বর্ষায় ইন্দ্রকে স্মরণ করায় এবং অন্ধকারে চান্দ্রমসী ভাবা তারকী ভাবা লিখিয়া অশ্বিনীকুমারের রসভাবের অনুভূতি দান করে—এই শান্তিপূর্ণ স্থানে বাস করিতেছি, মনে এক একদিন গভীর শান্তি আসে। ঐ ত আমার জীবনটাকে আমি একটু যেন তফাৎ হইয়াই দেখিতে পারি। যদিও জানি, আমার এখনো অনেক ঘাত সহিতে হইবে অনেক নূতন experience লাভ করিয়া আপনাকে চিনিতে হইবে।

আমি কিসে নষ্ট হইয়াছি এবং কোথায় আমার সৌন্দর্য্য সে আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। আমি কোমল, আমি সুন্দর, সৌন্দর্য্যপ্রিয়, শান্তিনিষ্ঠ,—আমি সৌন্দর্য্যরচনা করিবার শক্তি রাখি, আমি কবি।

ছেলেবেলার 'আমাকে' স্পষ্টই ঐ দেখিতে পাইতেছি। প্রকৃতির সঙ্গে আমার কি ভাব ছিল। বৃষ্টির দিনে কে আমাকে ঘরে রাখিবে? ঝড়ের দিনে কত ভাল লাগিত! বর্ষাবিদ্যুতের গর্জ্জনে কি নিবিড় আনন্দে হৃদয় কাঁপিত। বাহিরই আমার প্রিয় ছিল। ভিতরে থাকিতে আমার বিরক্ত লাগিত। মা পিসিমা তাই বোমের মেহের

মধ্যে আমার একটি সুন্দর বাল্যঘর ছিল। সেই আমাদের সরল অথচ সাধারণ হইতে তফাৎ Dignity-বিশিষ্ট ঘরটিতে কত শান্তিই ছিল। রামায়ণ পড়া, যাত্রা শোনা, মা পিসিমা দিদি এবং আরো নানা লোকের কি একটি শান্তির ভাব! শুধু অশান্ত ছিলেন বাবা! কিন্তু তাঁরও হৃদয় কত মধুর! স্নেহ কি অপার!

অনেক দুঃখ গেছে কিন্তু সে বাহিক। আজও গ্রাম্য প্রকৃতিটি আমার বুকের মধ্যে লাগিয়া রহিয়াছে। সেই দীঘি, সেই বটগাছ আমার কাছে দেবতার মত বোধ হয়। স্মরণমাত্রেই হৃদয়ে এমনি একটি অপূর্ব্ব আনন্দ এবং ঔদার্য্যের সঞ্চার হয় যে তাহা বলিতে পারি না।

কিন্তু সেই সুখের বাড়ীতেই আমার বিনাশের বীজও ছিল। অতি প্রশংসায় vanity অলক্ষ্যে তাঁহারা আমার হৃদয়ে জন্মিতে দিয়াছিলেন। তারপর স্কুলে গিয়া বিশেষতঃ বরিশালে স্কুল কলেজে এই vanity বাড়ে। আরও এক কথা এই যে বরিশাল স্কুলে বাহির হইতে আমাদের উপর morality imposed হইত। আমরা ভিতর হইতে সাড়া না দিয়া বাহিরেই imposition এর অনুরূপ সাড়া দিতাম। তাছাড়া বিশ্রীভাবে জীবন যাপন করায় ঐ সময়ে একটা কেমন খারাপ হইয়া গেছি। এখনো তার জের টানিতেছি। কিন্তু ওরি মধ্যে গুরুদেবের স্বর্ণময় কবিতার সহিত পরিচয় হয়। অবশ্য আগেও একটা কবিতার আস্বাদ পাইয়াছিলাম। ছেলে বেলা হইতেই কাব্য পড়া আমার আনন্দ। বরিশালেও ঢের উপকার হইয়াছিল। অশ্বিনীবাবু, জগদীশবাবু, পণ্ডিতমহাশয়,

পরেশবাবু প্রভৃতি গুরুগণের হৃদয়ের স্নেহধারে হৃদয় অনেকটা সিক্ত হইয়াছিল। কিন্তু গুরুদেবের কবিতাই আমাকে ধরিয়াছিল। সেই স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আজ উদয়াচলের ঘাটে আসিয়া ঠেকিয়াছি। রবিকিরণ প্রত্যক্ষভাবে আমার মর্ম্মের ভিতরে নামিয়া মধু-ভাণ্ডারটিকে পূর্ণ করিতেছে, দলগুলিকে বর্ণে পূর্ণ করিতেছে। কি মধুর মধুর কিরণ! কবিতা কেন আসে না? গান কেন আসে না? চিত্রাঙ্গদা কাব্যে পড়িয়াছি চিত্রাঙ্গদা বলিতেছে, প্রথম যেদিন অর্জ্জুনকে দেখিয়া প্রাণে প্রেম আইল সেই মুহূর্ত্তেই কেন ভাবাবেগের প্রেরণায় সমস্ত শরীর লাবণ্যে সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া না উঠিল? আমিও তাই বলি নিবিড় রবিকিরণ স্পর্শানন্দে সমস্ত হৃদয় কেন চরমতম সুরটি ধরিয়া গাহিয়া উঠে না? কিন্তু একদিন গাইব। সেই সঙ্গে সমস্ত জীবনের গান গাইব।

এখনো অনেক মিথ্যাকে দূর করিতে হইবে। এখনো অনেক কষ্টে বুদ্ধিকে উজ্জ্বল করিতে হইবে। সমস্ত স্বদেশকে, জগৎকে ভাল করিয়া দেখিতে হইবে,—এখনো প্রাণকে শান্ত হইতে শান্ত, নিবিড়লীন হইতে নিবিড়লীন করিতে হইবে। এখনো আলস্য পরিত্যাগ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ শক্তিকে সুমার্জ্জিত করিতে হইবে।

কবিতারচনার মত নিবিড় ব্যথা আমি কোন দিন ধরিতে পারিব না? জানি না—কিন্তু আজ অন্ততঃ এটা নিশ্চয় দেখিতে পাইতেছি যে একটা ভবিষ্যতের সাহিত্যের মধ্য দিয়া একটি শান্ত-সুন্দর গদ্য ধারা বহিয়া যাইতেছে, উহাই আমার। ঐ ধারা কল্পনা সৌন্দর্য্য এবং বিলাসের আক্রমে বদ্ধ এবং বিচ্ছিন্ন কিন্তু নিবিড়

বেদনার সুগভীর না হইতেও পারে। আমার চিত্তক্ষেত্রে বিচরণশীল এই তেজস্বী কল্পনামূর্ত্তিগুলি কবে বাহির হইবে?—আমি essentially Indian—ভারতের রস আমার প্রাণে বসিয়াছে।

—•—

Astronomy পড়িতে মনটি সৌরমণ্ডলের ছায়াআলোক আঁকা সুবিশাল প্রাঙ্গণের মধ্যে উঠিয়া ভ্রমণ করিতেছে। জুপিটারকে ছাড়াইয়া নীল নভস্তলের মধ্য দিয়া য়ুরেনাস্ নেপচুনের অভিমুখে যাত্রা করিলাম। মধ্যাহ্নকাল। তবু সূর্য্যকিরণ ক্রমেই অপ্রখর! নেপ্‌চুনের তীরে গিয়া উঠিলাম। ঘড়িতে ঠিক দেড়টা কিন্তু বিকালের মত সূর্য্যকিরণ নিস্তেজ অথচ নেপ্‌চুনের আকাশে মেঘ নাই। নির্ম্মল আকাশ! আমি একটা দেবতা, ধর কার্ত্তিক, স্কন্দবীর। আমার শরীর প্রকাণ্ড বাড়িয়া উঠিয়াছে। নেপ্‌চুন তটে উঠিয়া নীল আকাশের মধ্যে পা ঝুলাইয়া বসিয়াছি। আমার চক্ষু গ্রহগুলির গতি লক্ষ্য করিতে পারে! কি চমৎকার! (হয়ত) নেপ্‌চুনে ধরণীর শ্যামলতা নাই—(হয়ত) সেখানে মাটি নাই, আরেক রকম material কিন্তু সেই চিরপরিচিত নীলাকাশ এবং সূর্য্যরশ্মি তো সেখানেও আছে। দেবতার মত প্রকাণ্ড না হইলে কিছু দেখিবার জো নাই। অত বড় একলা পড়িয়া প্রাণ হুহু করিবে।—পৃথিবীতে একটি বড় জনশূন্য মাঠের মধ্যে সন্ধ্যার সময়ে একা পড়িলেই প্রাণ কি করিয়া উঠে।

রাত্রে যদি ধরণীর ছায়াটার বরাবর চলিয়া যাই? কি অন্ধকার! এবং অন্ধকারের মধ্যেই দূর নক্ষত্রলোকের প্রকাশ। হয়ত পালা-

পাশি কোন গ্রহের আলো আসিয়া অন্ধকার কাটিয়াকুটিয়া দিয়াছে। দিনের বেলা জলের মধ্যে ডুব দিয়া জলতলপতিত সূর্য্যালোকটি ভাঙ্গিয়াচুরিয়া দিলে যেমন আলোঅন্ধকারের কাটাকাটি দেখা যায় সেই রকম! কি চমৎকার!

আরো কত আশ্চর্য্য আছে। একটু একটু অগ্রসর হই, আর কল্পনা আমাকে একপ্রহর ধরিয়া আকাশে ঘুরায়—পড়া তেমন এগোয় না। ভারি বিপদ। তার উপরে আবার অলসতা এবং কাজের চাপ! ভারি বিপদ!

আচ্ছা, আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য এত ব্যাকুলতা কেন? নাম? কখনো না। নিজেকে পাওয়া। আমার সৌন্দর্য্যে যে একটা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন আভাস পাইতেছি ঐগুলি এক করিয়া একটি পূর্ণ জীবনের সুর শুনিবার আকাঙ্ক্ষা। গুরুদেব বলিয়াছেন আমরা নিজেদের সৃষ্টি করিবার জন্যই আসিয়াছি। বাস্তবিক ওটা যেন আমাদের একটা Original প্রেরণা! আপনাকে consciously না পাইলে সুখ নাই।

আমার আলস্য এবং চঞ্চলতাই আমার সৌন্দর্য্যরচনাকে প্রতিহত করিতেছে।

আলস্য এবং চঞ্চলতা জীবনের গুরুত্ববোধের অভাব হইতে জন্মে।

জীবনের প্রকৃত গুরুত্ববোধের অভাব গভীর প্রেমানুভবের অভাব হইতে জন্মে। কাল্চারের দরকার আছে। কাল্চার হইলেই

মনপ্রাণবুদ্ধি তৃষার্ত্ত হইয়া প্রেমের স্পর্শ চায়। মনপ্রাণবুদ্ধি সমস্তের উপর, কোন উচ্চ শান্তিদানক্ষমব্যক্তির স্থির প্রেমালোক পড়িলেই জীবনের সুর বাঁধা হইয়া যায়।

হে আমার হৃদয়ের প্রিয়তমগণ, তোমাদের ভালবাসা অজস্র আমার উপরে ক্ষরিত হউক—আমার আলস্যকলুষজড়ত্বমালিন্য প্রক্ষালিত হইয়া যাইবে।

ব্রহ্মচর্য্যের অভাবেই আমরা এত অপটু!

বোধ হয় ১৪ই বৈশাখ।

একশো সাত, পাঁচ, তিন কত ডিগ্রিতে আজ তাপমানে পারা-রেখা উঠিয়াছে জানিনা কিন্তু গরমটি বেশ। ঘরের মধ্যে নিজেকে বন্ধ করিয়া শুইয়া যে বড় ভয় পাইয়াছি তাহাও নয়। শনি গ্রহকে যে দিন আগের বেষ্টন তার কপালের চারিদিকে পরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল সে দিন তার যেমন বোধ হইয়াছিল—বাহির হইয়া দপদেপে রৌদ্রে ভরা মাঠের দিকে চাহিলে প্রায়বুঝি সেই রকমের ভাব মনে আসে। কি জানি ভাবটা প্রকাশ হল কি না কিন্তু এই যে সেই পোড়া সোনার মত উজ্জ্বল এবং তপ্ত আকাশের মূর্ত্তি, প্রান্তরের মূর্ত্তি—তার মধ্যে মাঠের ব্যাপ্তি—দূরের লাল সুরকী ঢালা রাস্তা—যেন ইহার চেয়ে কম আলোকে লক্ষ্য করা যাইত না। শুষ্ক নদীখাতের মত নিম্ন জায়গাটারও ধূসর কলেবর যেন পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখা যায়—অতদূরে অথচ ওর মধ্যে সব ছোট উচু নীচু গুলি তীব্র সোজা হইয়া অথবা বাঁকা হইয়া (যায় যেমন) দৃষ্টিকে শক্ত করিয়া

ধরিতে চায় "আজ আমাকে দেখিতেই হইবে।" কিন্তু মাঠের দিক্ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া শান্তিনিকেতনের দিকে পিছনের দিকে প্রেরণ করিলে গাছগুলি বড় চমৎকার। এই প্রখর রৌদ্রের মধ্যে কেমন গাঢ় সবুজ স্নিগ্ধ পাতার রাশি! চমৎকার! কোন হোমের জলন্ত বহ্নির মধ্যে নবজলধরমূর্ত্তি গোপবেশ বিষ্ণুর মত। ছেলেদের দারুণ জ্বরের সময়ে মায়ের সস্নেহ হাত বুলানোর মত। আমার ওই গাছের মধ্যে মাথা দিয়া দাঁড়াইতে ইচ্ছা হয়। আমি একাহারা গাছগুলির কথা ভাবিতেছি না—এ গুলির ভাব তত গাঢ় নহে—ওই ঝাপ্সা গাছগুলিই চমৎকার। রৌদ্রের মধ্যে কতটুকু কতটুকু ছায়া টানিয়া দিয়াছে। কাল্পনিকদের সহজেই কল্পনা হইতে পারে ও ছায়াতলাটি একটি বিশেষ স্থান, কোন বিশেষ সুন্দর যুবক যুবতীর ওখানে বাস। কিন্তু কল্পনার চেয়ে সহজ ভাবই ভাল, বেশী কল্পনায় মাথাকে পীড়িত করে, শেষে বলিতে হয়

"Scare away this mad ideal
spare me thou the only real"

বাস্তবিক—ব্রাউনিংএর নায়ক যেমন দীপান্বিত ভিনীসের মধ্য-দিয়া সন্ধ্যাবেলায় গণ্ডোলায় নিজের অভিসারিকাকে লইয়া বাহিয়া চলিয়াছিল—তখন কল্পনাকে তার মনকে অধিকার করিবে সে ত খুব স্বাভাবিক। কিন্তু সন্ধ্যাসত্বেও অতিকল্পনা realএর সৌন্দর্য্যের কাছে পরাভব মানিতে ছিল। রৌদ্রের মধ্যে গাছ দেখিতে দেখিতেও প্রথমটা কল্পনা করিতে ইচ্ছা করে—কিন্তু কিছুকাল পরেই সেটা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিয়া the only real মাটির-দিকে-চাহিয়া-থাকা

মাটিতে-ছায়া-ফেলা নধর গাছটিকেই ভাল লাগে—চক্ষু এবং তারসঙ্গে শরীরের তাপ জুড়াইয়া আসে। গাছ আমাদের বড়ই প্রিয়।

দরজা খুলিয়া বাহিরে দাঁড়াইলে এই অনন্ত আগুন ছাড়া কাহার সাধ্য আর কোন কিছুর কথা ভাবা। কিন্তু দরজা বন্ধ করিয়া যখন শুইয়া পড়িয়া—পাঠে অন্যমনস্ক থাকিতে থাকিতে এক একবার হাওয়ার দিকে কান গিয়াছিল তখন অন্যান্য অনেক দুপহরের কথা সহজেই মনে আসিতেছিল।

যাহা এত সহজে আসে, যাহার স্মরণে এত সুখ পাই—তাহা আমার বুকের মধ্যেই আছে। বাস্তবিক ভাবিয়া বড় সুখ পাইতেছি। বোলপুরের মাঠ! বাপরে! সে তোমার মত নহে—সে উজিরপুর-গ্রাম। সে এক ইঁটের প্রকাণ্ড ভাঙ্গাবাড়ী—এখানে যেমন হাওয়ার শব্দ শুনিতেছি, সেখানেও এমনি ছিল, কিন্তু এখানে হাওয়া আসিতেছে প্রকাণ্ড মাঠ' পাড়ি দিয়া, সাঁ সাঁ করিয়া মাতালের মত জড়াইয়া ধরিতেছে আসিয়া বড় বড় কতগুলা শালগাছকে (উদার মাঠের পারে বিরাট শালই শোভা পায়!) কিন্তু সেখানে হাওয়া আসিয়াছিল বড় বড় বাঁশবন অশ্বত্থকুঞ্জ সুপারিকুঞ্জের মধ্য দিয়া এলিয়া ঢেউ খেলাইয়া—আর রব তুলিয়াছিল ভাঙ্গাদালানের উপরে-ওঠা তরুণ সব অশ্বত্থবটের উপরে। তাছাড়া এখানকার এই শুষ্ক মরুপ্রায় বিরাট প্রান্তরের বদলে সেখানে ছিল একটি গাছগাছড়াসঙ্কুল পোড়ো বাড়ীর প্রাঙ্গণ। মধ্যাহ্নকাল। সকালে ঘুমাইয়াছিল আমি একটি কক্ষে বসিয়া একটা জংলা তীরওয়ালা একটা আঁধি পুকুরের দিকে বুঝি চোখ দিয়া খুব সম্ভব সংস্কৃত কোন কাব্য পড়িতে-

ছিলাম। কাব্য না বলিয়া বই বলা উচিত—কারণ তখন তাহাতে বড় একটা যে কাব্যরস পাইতাম তা নয়, তবে কল্পনা খুব stimulated হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু সেদিনকার রোমান্স রস ছিল বাহিরের গাছপালার উপর গলিয়া-পড়া সোনার রৌদ্রের unconscious অনুভবে। তখন বাহির হইতে বড় জ্যেঠা মহাশয় আমাকে ডাকিয়াছিলেন। বুড়ো আমাকে ভাল বাসিতেন। বাস্তবিক রক্তের টান কি মধুর। জ্যেঠামহাশয়ের Poetic mind ছিল। ৫৫।৫৬ বৎসরের দুর্জ্জনতা সত্ত্বেও সেদিনকার নির্জ্জন দুপহরের রসে তাঁহার বুকের মধ্যে ভাল লাগিয়াছিল। বুকের মধ্যেই বলা যাউক। তিনি আমাকে ডাকিয়াছিলেন উড়ন্ত একপাল পাখীর প্রয়াণ দেখাইবার জন্য—কারণ আমারো Poetic mind কিনা? Poetic mind বা Poet mind বা ঐরূপ একটা কিছু, আমার ঠিক স্মরণ নাই—ওটা বুড়ার ইংরাজী। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে আমিতো অবহেলা করিতে পারি না—সেদিনকার আকাশের রৌদ্রভরা অগাধ নীল আমার বুকের মধ্যে অনুভব করা যাইতেছে—তার মধ্যে পুঞ্জিত সাদা মেঘগুলির স্থানে আমার সাদা ফুস্ ফুস্ পুঞ্জিত হইয়া থাকিতে পারে। Dream on, Dream on, not fancies, not weak shapes of Elves and else—শুধু নির্ম্মল উজ্জ্বল আকাশ—পরিস্ফুট মেঘ, সরস বনরাজী, নিস্তব্ধ পোড়োবাড়ী, বুড়া জ্যেঠার স্নেহ—এবং আজিকার-দিনে সেই সুগভীর tragic জীবন হইতে অপহৃত জ্যেঠামহাশয়ের স্মৃতি—যার সঙ্গে একটু দুঃখ আছে। এই দুঃখে অনেক দুঃখ মনে পড়িতেছে যে। আমার সেই গ্রাম্যবাড়ী, সেই দরিদ্র ক্লিষ্ট

পিতা মাতা ভগ্নী, cultureএর অভাবে uncouth অথচ পরম সুন্দর ভাই এবং আর একটি কালো মেয়ের কথাও মনে পড়িতেছে।

ইতিমধ্যে ঐ দেখ দিগন্তের বনরেখার উপরে একটা misty আবরণ পড়িয়াছে। আকাশের মুখ sullen। অথচ মেঘের কোন মূর্ত্তি দেখা যায় না অথচ একটা পুরু ধূসর ঢাকাতে সূর্য্যকিরণ ঢাকা পড়িয়াছে। যে সূর্য্যকিরণের নদী—আমার প্রাণের মধ্য দিয়া দূর শৈশব পর্য্যন্ত বহিতেছিল, যাহার স্রোতে ভাসিয়া সেই সুন্দর দ্বীপটিতে আমি গিয়া ঠেকিয়াছিলাম, সে সূর্য্যকিরণস্রোত সহসা কার ইন্দ্রজালে রবিপীতজলা সরস্বতীর মত বালুকায় ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে—ঠিক বালুকার মত sullen সমান আচ্ছাদনে আকাশ আচ্ছাদিত হইয়াছে। আর আমি সেই দ্বীপের স্মৃতি তেমন ভাল করিয়া জাগাইতে পারি না। স্মৃতি জাগাইবারও stimulus চাই। দীপ্ত রৌদ্রে কেমন সহজে মনে পড়িয়াছিল। কারণ তখন বেশ স্রোত পড়িয়া গিয়াছিল। এখনও আমি চেষ্টা করিলে হয়ত সে স্মৃতি জাগাইতে পারি কিন্তু সম্মুখের বালুঢাকা কিরণনদীর দৃশ্যটি কিছুতেই তার সঙ্গে মিলিবে না। বাহ্যিক প্রকৃতি সর্ব্বদাই আমাদের মনের উপর তাহার একখানি হাত রাখিয়া দাঁড়ায়—আমি এখন এই কর্কশ হাতটা সরাইয়া সেই বহুদিন আগেকার একটা সরস হাত কল্পনাবলে জাগাইলেই সে মরা হাতের তেমন সুখস্পর্শ আর থাকিবে না। বর্ত্তমানের এই জ্যান্ত হাতটিই বেশ ভারের সহিত এখন অনুভব করিতেছি। বাস্‌ তাই করি—প্রকৃতির উপর আজ জোর করিব না—অতএব চুপ রই।

বোধ হয় ১৫ই বৈশাখ।

রোজই কি ডায়ারী লিখিতে হইবে—তা না হ'লে ডায়ারীর অর্থ রৈল কোথা? কিন্তু আমি বড় অলস। আত্মজ্ঞান লাভ করিতে আমার যে সর্ব্বদাই প্রবল ইচ্ছা আছে এ কথা কখনই সত্য নহে। অত পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করে না, মনে হয় সুখে দুঃখে সৌন্দর্য্যে মিলিয়া উঠুক জীবনটা একরকম করিয়া জগৎ-তরুকে জড়াইয়া—ইহা একমাত্র অলসতারই পরিচায়ক—আর কিছুই নহে।

জগৎ-তরুটিরে জড়াইয়া
উঠুক্ হৃদয়ের লতা—
কোমল মৃদুশাখা ছড়াইয়া
কখনো পাতাভারনতা!
পাতালে আছে বুঝি মূল তার
রসাল রসাতল দেশে,
এসে সে ধরণীর কূল তার
বিকাশে যৌবন হেসে—
পারে না দাঁড়াতে সে বলবান্
গ্রীবাটি চলাইয়া পড়ে,
মৃদুল বায়ুভরে চলমান
রবে সে জগতেরে ধ'রে!
জগৎ-তরুটিরে জড়াইয়া
উঠুক্ হৃদয়ের লতা

যখন চারিদিকে ছড়াইয়া
না জানি নিজ মনোকথা !

অনেক রহস্যের আস্বাদ পাই—nature-bookই ভাল লাগে। বাঃ কি চমৎকার। সন্ধ্যার তলে বসিয়া কাল রথীর সঙ্গে যখন তারার সম্বন্ধে কথা বলিতেছিলাম তখন nature কে এত palpably অনুভব করিতেছিলাম। ক্রমে ক্রমে আমার উপরে জড়ত্ব কাটিয়া যাইতেছে। বিশ্বাত্মা কবে প্রকাশিত হইবে! not so idly ! moral lifeকেও উন্মুক্ত করিতে হইবে। আজ আমার তৃষ্ণা জাগিতেছে এবং মিটিতেছে—যেমন জলে ডুব দিলে জলের স্পর্শ আরও পাইতে ইচ্ছা করে এবং স্পর্শাকাঙ্ক্ষা সেই মুহূর্ত্তে মেটেও বটে।

nature-bookই একমাত্র পাঠ্য। বইগুলি পড়িয়া শুধু দূরদেশ ও কালের সঙ্গে আপনাকে মেশানো। সে হিসাবে ক্ষুদ্রতম বটতলার বইও কত মূল্যবান্। কিন্তু এক এক সময়ে immediate-কে ছাড়া আর কিছুই জানিতে ইচ্ছা হয় না।

আজ কাল এমন সৌন্দর্য্যময় পুরীতে সন্ধ্যামধ্যাহ্নের রঙের তাপের শীতলতার ঢেউয়ের মধ্যে, রবিবাবুর সুন্দর হৃদয়ের স্পর্শের মধ্যে সরল বালকগুলির স্নেহ ভক্তির মধ্যে আছি, বেশ আছি। আজ কাল মনে হয় হে দেবতা, যে তৃষ্ণা মিটাইয়া পান করাইতেছ সংসারের আঘা-তের মধ্যে লইয়া গেলেও আমি ভয় পাইব না। হয় ত ভয় পাইব কে জানে—হয় ত আমি ভীরু। বাবা মায়ের সংসারের কাজ যে কিছু করিতেছি না এ হয় ত self-indulgence কিন্তু যদি এত পাপীই হই তবে জগদীশ্বর এত শান্তি পান করাইতেছেন কেন?

বোধ হয় ইহার পরে আলস্যের শাস্তি আসিবে—আসুক্ ভয় পাব না।

এখনো আমি পাকা-আর্টিষ্টের হাত পাই নাই। নিজের imagination এর sensibility গুলিকে humanise করিয়া হাতে লইবার মত করিয়া লইতে পারি নাই। এখনো আমার sureness আসে নাই। আমি এক জেলে। আমার স্বর্ণসূত্রে গাঁথা জাল জীবনসমুদ্রের মধ্যে ফেলিয়া বসিয়া আছি। সমুদ্রের পরে সন্ধ্যা, মধ্যাহ্ন, প্রভাত কত তরণী কত জাহাজ অনন্ত আকাশ এবং বনরেখা, ঢেউয়ের মত আন্দোলিত—আমি এখনো জাল টানিতে পারি নাই। এখনো উহা সমুদ্রের তলায় কি পড়ে না। অধৈর্য্য হইয়া কিছুদূর যদি তুলিতো স্বচ্ছজলের মধ্যে তাহাতে দুটি একটি উজ্জ্বলশীতল শৈবাল মাত্র দেখিতে পাইব—সোনার মাছও না, ইন্দ্রধনুবর্ণ রত্নও না। তাই গভীর রাত্রি পর্য্যন্তও বসিয়া আছি তুলিতে সাহস করিতেছি না। এই যে একটু টান দিলেই ভারবোধ করিতেছি এ শুধু জলের ভার। কিন্তু আমার বলবান বাহু থাকিলে, সাহস থাকিলে কিছু উঠিবার আশা না থাকিলেও বার বার তুলিতাম, আবার ফেলিতাম! ঐত! আমি অলস, কিন্তু আরো বিপদ আছে বুঝি। আমি কেন ভাবি জালে বুঝি জল উঠিবে। ভুল আশা করিতে না পারা বুঝি একরকম হীনপ্রকৃতির কাজ। দশটা ভুল আশা করিলে বুঝি একটা সত্য হয়! যাক্, সে সব বীরের বিষয় কল্পনা করিয়া কাজ নাই। জাল উঠিল কি নাই উঠিল।—অতলতার নিশ্বাস আমার গায়ে লাগিয়াছে—

উহার সন্ধ্যাপ্রভাত আমার চোখে ছুলিয়াছে - কিছু না ভুলিতে পারি তো আনন্দমনে নিশীথে আমিও বিশ্বরহস্যের মধ্যে আমার জ্ঞানের পদবীতে প্রয়াণ করিব, ভয় কি ?

বাস্তবিক আমি কি মিথ্যার জালে জড়াইয়া গিয়াছি ! নিজের প্রাণের ভিতর হইতে দিনের মধ্যে ক'টা কথা বলি, এতদিন বসিয়া যাহা শিখিয়াছি তাহা এখন ভুলিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় ।

শেখা কথা ছাড়া যেন আর বলাই যাইবে না। আমি স্পষ্টই দেখিতেছি আমার মনের উপরে একটি আবরণ পড়িয়া আছে, কবে যে উন্মোচিত হইবে । ধীরে ধীরে যেন উন্মোচিত হইতেছে ।

আজ দুপুরে ঘুমাইয়াছিলাম। ইতিপূর্ব্বে Mathew Arnoldএর কতকগুলি কবিতা পড়িতেছিলাম । ঘুমের মধ্যে একএকবার আধ আধ জাগিয়া চমৎকার একটি মুক্তি বোধ হইতেছিল। বোধ হইতেছিল যেন অনেক tenderness এর সহিত হৃদয়ের যোগ অনুভব করিতেছি— শতস্রোতে মাধুর্য্য আসিয়া প্রাণের নীচটি ভরিয়া ফেলিয়াছে ।

আমারি হৃদয়ের গতিবিধি আমি ঠিক করিয়া চিনিতে পারি না। । কিন্তু মস্তিষ্কের উন্নতিটা বেশ দেখিতে পারি । Imagination এর খাত বাহিয়া কি যে ভাবস্রোত জগত হইতে আমার হৃদয়ে আসিয়া নিশিদিন পড়িতেছে—সেটাও তত পরিষ্কাররূপে ধরিতে পারি না । সাক্ষাৎ হৃদয়ের বিনিময়ে কি হইতেছে সেটাও ঠিক বুঝিবার জো নাই—দু এক সময়ে বড় কষ্ট হয়, আবার আনন্দ হয়—না জানি

এই ভাল। মৃত্যু সম্বন্ধে চিন্তা আমার বড় আসে না, ইহাতেই বুঝিতে পারি গভীরতর জীবনসম্বন্ধেও আসে না। অর্থাৎ এখনো আমার আত্মার সুপ্ত নির্ঝরগুলি আমার দৃষ্টিপথে খুলিয়া যায় নাই। তবে আজ মহাকালসম্বন্ধে ভাবিতে ভাবিতে মৃত্যুর কথা যেন আভাসের মত মনে পড়িতেছিল।

Morbid কাহাকে বলেনা সেইটাই আজকাল ভাল করিয়া বুঝিতেছি। কারণ প্রকৃতির বিরাট আনন্দের মধ্যে দাঁড়াইতে শিখিতেছি। কি আশ্চর্য্য প্রকৃতি।

কাল আমরা খস্‌খসের পর্দ্দাঢাকা রথীন্দ্রের কক্ষে শুইয়া, বসিয়া, লুটিয়া, গরমে হেলাহেলি করিয়া দুপুর যাপন করিতেছিলাম। এখন বোধ হইতেছে তখনও এক বিরাট প্রকৃতি এবং অনন্ত প্রকৃতি আমাদের চতুর্দ্দিকে ছিল। তখনও সেটা না বুঝিয়া একরকম বুঝিতেছিলাম, কিন্তু কি আল্‌সেমিটাই করিতেছিলাম। হঠাৎ মাঠের উপর ছায়া পড়িতে লাগিল। পশ্চিমউত্তর কোণা হইতে আকাশের উপরে বড় বড় মেঘ জলে ভারি হইয়া কালো হইয়া টলমল করিয়া আসিতে লাগিল। অল্প একটু একটু হাওয়া। হঠাৎ বাহির হইয়া দেখি দূরে হাওয়া উঠিয়াছে। আমরা মাঠে নামিয়া দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করিলাম। আঃ এই বিরাট মাঠের মধ্যে ধূলিরাশির হুহু করিয়া দৌড়াইয়া যাওয়ার দৃশ্যটি কি চমৎকার। ভেরীরবে আহূত যুদ্ধযাত্রী হাজার হাজার অশ্বারোহীর মত হোঃ হোঃ করিয়া ধূলিপটল ছুটিয়াছে। ক্রমে

মেঘে ধূলায় মিলিয়া একটা ঘোর অন্ধকার হইয়া গেল। একটু দূরেই আর কিছুই দেখিতে পাই না। যে দিক হইতে পবনদেব আক্রমণ করিতেছিলেন সে দিকে মুখ ফিরাইবে কাহার সাধ্য। অভ্রলেখা পৃষ্ঠেই লইতে হইল। তাও দাঁড়াইয়া থাকা মুস্কিল, এত ছিটা গুলি আসিয়া পিঠের উপরে বর্ষিত হইতে লাগিল। তখন কাজেই হাওয়ার সঙ্গে দৌড়াইতে লাগিলাম। ভারি আনন্দের আশায় সকলকে ছাড়িয়া মাঠের মধ্যে দৌড়াইয়া যাইতে লাগিলাম। এমন হাওয়ার মধ্যে পড়িলে গম্ভীর লোকদেরো পাগল হইতে হয়। পায়ে কাঁটা ফুটিয়া গেল। তখন বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। ভয়ঙ্কর বেগে গুলি পিঠে লাগিতেছে, দৌড়িয়া একটি বটগাছের কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। আমাকে পাড়িয়া ফেলিবার যোগাড় করিতে লাগিল। আমি বট-শিশুর কাণ্ড জড়াইয়া, জোর করিয়া তার উপরে চিৎ হইয়া পড়িয়া কোন রকমে টিঁকিয়া থাকিলাম। বর্ষার সৌন্দর্য্য দেখিতে চেষ্টা করা তখন বৃথা। ঝড়ের শক্তি তখন অসহায় ভাবে অনুভব করিতেছিলাম। আমার কাপড় ছিঁড়িয়া লইয়া যায় প্রায়, বটাশ্রয়টি ছাড়িয়া এক পা অগ্রসর হই তো তখুনি আমাকে ফেলিয়া দেয়। তখন আবার অশনি ডাক ছাড়িল। চারিদিকে বিরাট মাঠ। ভাবিলাম বটের গোড়ায় আছি, যদি বজ্র পড়ে। বট এবং বজ্র দুটাতে কি একটা সম্পর্ক আছে—ছেলেবেলা শুনিয়াছিলাম—কেমন গোলমাল ভাবে, তাই মনে আসিতে লাগিল। একবার ভাবিলাম শুইয়া পড়ি কিন্তু সে ভাবটা মনকে অধিকার করিল না—গাছ আঁকড়িয়া দাঁড়াইয়া রহি-লাম। এখন মনে হয় শুইয়া পড়িলেই ভালই হইত। আমার খাস

রোধ করিয়া আসিতে লাগিল। বমি বমি করিল। মুহূর্তের জন্য মনে হইল সমস্ত জীবনটাই এখনি বমি করিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু তেমন ভয় হইল না। কোথাও নড়িতে পাইবার যো নাই, অথচ ঐ ভীষণ মার খাইতেছি তবু ব্যথাসত্ত্বেও—মোটামুটি ভালই লাগিতেছিল—অথবা এখন লাগিতেছে জানি না। যা হোক্ সেই রুদ্র ঝঙ্কার সঙ্গে মিলাইয়া যথাসম্ভব উচ্চ কণ্ঠে বার বার ওঙ্কার শব্দ উচ্চারণ করিয়া উঠিলাম। ভারি চমৎকার লাগিল। মনে হইল বমি বমিটা আর নাই। ক্রমে ঝড় পড়িয়া আসিল—বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, কিন্তু বৃষ্টিও থামিয়া আসিতে লাগিল। আমি মাঠের বিচিত্র গেরুয়া রঙের জলপ্রবাহের মধ্যে দিয়া ফিরিতে লাগিলাম। ভীষণ বেগে গেরুয়া জলে সাদা ফেনা তুলিয়া স্রোত নামিয়া যাইতেছে। আমি স্রোতের উপর উঠিতেছিলাম, পায়ের পাশে হু হু করিয়া জল ছুটিয়া যাইতেছিল, মনে হইতেছিল যেন আমি ভারি অল্প অগ্রসর হইতেছি। যাক্ ফিরিয়া ত আসিলাম। স্নানান্তে মাথাধরাটা (যাহা পরের সময়ে হইয়াছিল) ছাড়িয়া আসিল। তখন ঝড়বৃষ্টি থামিয়া সব চুপ—আকাশ মেঘলা কোমল, মাঠ সিক্তচ্ছবি কিন্তু শুষ্কপ্রায়। চমৎকার খেলা! চা পান করিয়া বাহির হইলাম। ছোট বকুল গাছটির কাছে গিয়া বকুলফুল খুঁজিবার চেষ্টা করিলাম। ভাল ফোটে নাই। দু-চারিটি ছিঁড়িয়া লইলাম। গন্ধ লইতে কেমন একটা আকুলতা হইল। ঝড়ের মার খাইয়া সমস্ত শরীর শিথিল—ছোট বকুল ফুলটির গন্ধে মনে হইতেছিল ধরণী মা সান্ত্বনার জন্য এবার বুকের ভিতর হইতে একটি সুক্ষ্ম অন্যক্ষীণ-রেখা, আমার প্রাণের মুখে ক্ষরিত করিতেছেন। বাস্তবিক

ঐ একটি বকুল ফুলের গন্ধ আমার প্রাণে প্রবেশ করিয়াছে। ওর কথা অনেক দিনে ভুলিব না। ভারি আকুল করিয়াছিল। ওয়াড্‌স্‌ওয়ার্থকে কে মনে পড়িতে লাগিল। সকালে বেলা Daffodils প্রভৃতি কবিতা পড়িয়াছিলাম। Wordsworthএর ভারি একটি সুন্দর প্রাণ ছিল—এই সব ছোট ছোট সান্ত্বনাধারায় তাঁহার প্রাণ রসসিক্তি হইয়াছিল। বাস্তবিক কল্পনা নাই, মহত্ত্ব নাই, কিন্তু সরল সত্য সৌন্দর্য্যের একটি গভীর সান্ত্বনা Wordsworthএর মধ্যে আছে। কাল বকুলফুলটির সৌগন্ধ্যে আকুল হইয়া Wordsworthএর সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করিতেছিলাম। ধরণী-মা কি-সব ছোট ছোট সৌন্দর্য্য আমাদের চারিদিকে ছড়াইয়া রাখিয়াছেন—আমাদের চক্ষু থাকিলে কি গভীর সান্ত্বনা পাওয়া যায়। Wordsworthএর কবিতায় এই সরল সৌন্দর্য্যের সান্ত্বনা আছে। বাস্তবিক আমরা কতগুলা বড় কল্পনা লইয়া কি করিব? যতই ক্ষুদ্র হোক, সত্য এবং শান্তি চাই।

Scare away this mad Ideal
Spare me thou the only Real.

Only real কত গভীর, তাই চাই। তার মধ্যে শান্তি চাই—তার মধ্যে মহত্ত্ব হইলেতো চমৎকার। Wordsworth প্রকৃতির ভিতর হইতেই সেই Subdued quiet অথচ গভীর প্রেরণাগুলি ধরিয়াছেন; ভারি আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু Indian প্রকৃতি Indian কবিকে যে পরিপূর্ণতা যে সমারোহের সহিত আচ্ছন্ন করে—তাহা Wordsworthএ নাই, কীট্‌সে একটু আছে।

কালিদাস, বাণভট্ট, ভবভূতি, বৈষ্ণব কবি, রবীন্দ্রনাথ—উঃ প্রকৃতি ইঁহাদের প্রাণে কি অদ্ভুত ঔদার্য্যের সহিত স্ফুরণ পাইয়াছে। "আকুল করেছে শ্যাম সমারোহে হৃদয়-সাগর-উপকূল"। সত্য সত্যই তাই।

আজ রবীন্দ্রনাথকে আরও ভাল করিয়া চিনিলাম। সন্ধ্যার দিকে আমাদের পাঠসভা বসিল। সম্মুখে উদার মাঠে আকাশ মেঘল কোমল আচ্ছাদনে ঘেরা, মাঠে ছায়া, মৃদুশীতল বায়ু। পড়িতে আরম্ভ করিলাম। 'কল্পনা' লইয়া প্রথমে "আজি এই আকুল আশ্বিনে" পড়িলাম। এক রকম লাগিল। কিন্তু "বর্ষশেষ" পড়িতে গিয়া আমার মধ্যে বিদ্যুৎসঞ্চার হইল। বুক ফাটিয়া স্বর বাহির হইতে লাগিল। সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। এবার কবিতাটি বুঝিলাম। কালিদাসের splendour আছে, সমারোহ আছে—majestic flow আছে, শান্তি আছে। কিন্তু একি weird বুকভাঙ্গা বৈদিক কবির মত ক্রন্দন! এ যে রুদ্র ইন্দ্রের দিকে উত্থিত গান!

এখন আমি বুঝিলাম ঋষিরা কেন বলবান ছিলেন এবং কেন তাঁহারা বলিয়াছিলেন "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো।" এই কবিতা-টিতে রবিবাবু যে বলের অনুভব করিয়াছেন তাহাতে ইন্দ্রের একটু আভাস পাওয়া যায়। Broadness কালিদাসের বেশী আছে। কল্পনার গুহাগতি তাঁহার বেশী। এই যা—তা না হইলে রবীন্দ্র-নাথ কালিদাসেরই সমান। সেই রকম পূর্ণ ছন্দ; সেই রকম spirituality।

ক্রমে রাত্রি হইল, অনেক পড়া হইতে লাগিল। প্রায় সমস্ত

'কল্পনা' পড়িলাম। 'মানস সুন্দরী' পড়িলাম—সুরেনবাবুর অনু-রোধে। সেটা কল্পনার পর তেমন জমিল না—সুরেনবাবু সেটি অনুভব করিলেন; তিনি বলিলেন, আগে পড়িলেই ভাল হইত। আমার কণ্ঠ কাল খুলিয়া গিয়াছিল। আমি shy, তবু গলা যতদূর চড়ে চড়াইয়া "বর্ষামঙ্গল" গাইয়া গেলাম। 'সুন্দর চোর' প্রভৃতি কবিতায় এমন দোলান সুর আসিয়া পড়িল। 'স্বপ্ন' কবিতার গূঢ়ব্যাকুল সৌন্দর্য্য সম্যক্‌ আদায় করিলাম। বাস্তবিক ভাল পড়া না হইলে কবিতা কিছুই বোঝা যায় না। কাল হঠাৎ আমার ঠিকমত পড়া হইয়াছিল। এবার রবিবাবুর সুর পাইয়াছি। রবি-বাবুকে পড়া সহজ নয়। একটা অতি তীব্র সুর, কখনো দোলান-সুন্দর, কখনো স্তব্ধশান্ত কখনো করুণ-ব্যাকুল। প্রকৃত গীতি-কবি। বৈষ্ণবের কবিতা গান—রবিবাবুর কবিতাও গান—কিন্তু তার মধ্যে কয়েক grade তফাৎ আছে। যাহাতে উহা modern এবং Literature। কালিদাসের মত স্থির বর্ণনার সুর রবিবাবুর নহে, তবে মেঘদূতের শেষভাগের সুর রবিবাবুর সঙ্গে অনেকটা মেলে। ক্ষণিকার সঙ্গে মেলে, কল্পনার সঙ্গে মেলে। রবিবাবুর গোড়া হইতে একটা কিছু ভিতরের দিকে টান আছে। কালি-দাসের গোড়ার দিকেই বহির্জগতের উপরে সহজে বিভূতি। কিন্তু শেষের দিকে দুজনেই প্রায় সমান। শেষের দিকে রবিবাবুর Spiritualityও বিস্তারে এবং কল্পনাসম্পদে স্ফূর্ত্তশোভিত, কালি-দাসের বিস্তার এবং কল্পনার সম্পদও পরিপক্ক এবং অধ্যাত্মরহস্যে সুগম্ভীর! তবু যেন কালিদাসের বিভূতি বেশী। সে দেখা যাইবে।

তবে শিক্ষা এবং সময়ের গুণে এমন একটা Spiritual ভাব রবিবাবুর আছে যাহা কালিদাসের নাই।)

যাক্, ক্রমে রাত্রি হইল, দিনুবাবু গান আরম্ভ করিলেন। আর সব গান একরকম লাগিল। "কিন্তু ভালবেসে সখি নিভৃতে যতনে" গানটি লাগিল কি চমৎকার! বাঃ আত্মসমর্পণের অনুনয় স্বরটি কি চমৎকার খুলিয়াছে! কবিতাটির মধ্যে ভারি একটি সুন্দর ভাব রহিয়াছে। প্রণয়ী, সখিকে তার প্রসাধন তার অলঙ্কার তার সব সাজসরঞ্জামের মধ্যে আপনার চিহ্ন রাখিয়া দিতে চাহিতেছে। এখানে পুনরুক্তি, নানা আশ্রয়ের উল্লেখ খুব স্বাভাবিক; অবশেষে আরকিছুই না বলিয়া চরমস্বরে বলা হইল "আমার সকল জীবন মরণ টুটিয়া লুটিয়া নিয়োগো তোমার অতুল গৌরবে"—তোমার সমস্ত মহিমার মধ্যে আমার চরম অবসান।

তারপরে স্থির জ্যোৎস্নাময় শীতলস্পর্শ রাত্রি। দূরে দিগন্তের কাছে যত সব ফিকা মেঘের প্রাকারে পাহারা সৈন্যদের বড় বড় বিদ্যুৎকেতন চমকাইয়া Signal প্রদান। কিন্তু ভুল করিয়া ছিলাম। উহা পুনরাগত ঝড়ের Signal নয়, ও প্রস্থানোন্মুখ মেঘ-পোতের বিদায় Signal। তাইত, বোলপুরের আকাশের উপর হইতে সমস্ত ছিন্নবিচ্ছিন্ন মেঘগুলি গুছাইয়া পবনদেব তাঁহার মস্ত fleet লইয়া আবার কোথায় চলিলেন। আমি ও রথী জ্যোৎস্না-ময় মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে ভূকম্প, ঝড় প্রভৃতি সম্বন্ধে আলাপ করিতে লাগিলাম। বাস্তবিক আমরা মরণের সমুদ্রের উপর ছোট জীবননৌকা দুলাইয়া কি উপহাসজনক চঞ্চলভাবে দাঁড় বাহিয়া

বেড়াইতেছি। তবু কিছু ভয় বোধ হইল না; আরি চমৎকার বোধ হইল, এখন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিতে ইচ্ছা হয়।

কাল প্রকৃতির রুদ্রবেশ দেখিয়াছি, পৃথিবীর সুমধুর সান্ত্বনাও বুঝিয়াছি—আমার morbid না হইবার যথেষ্ট কারণ আছে।

———*———